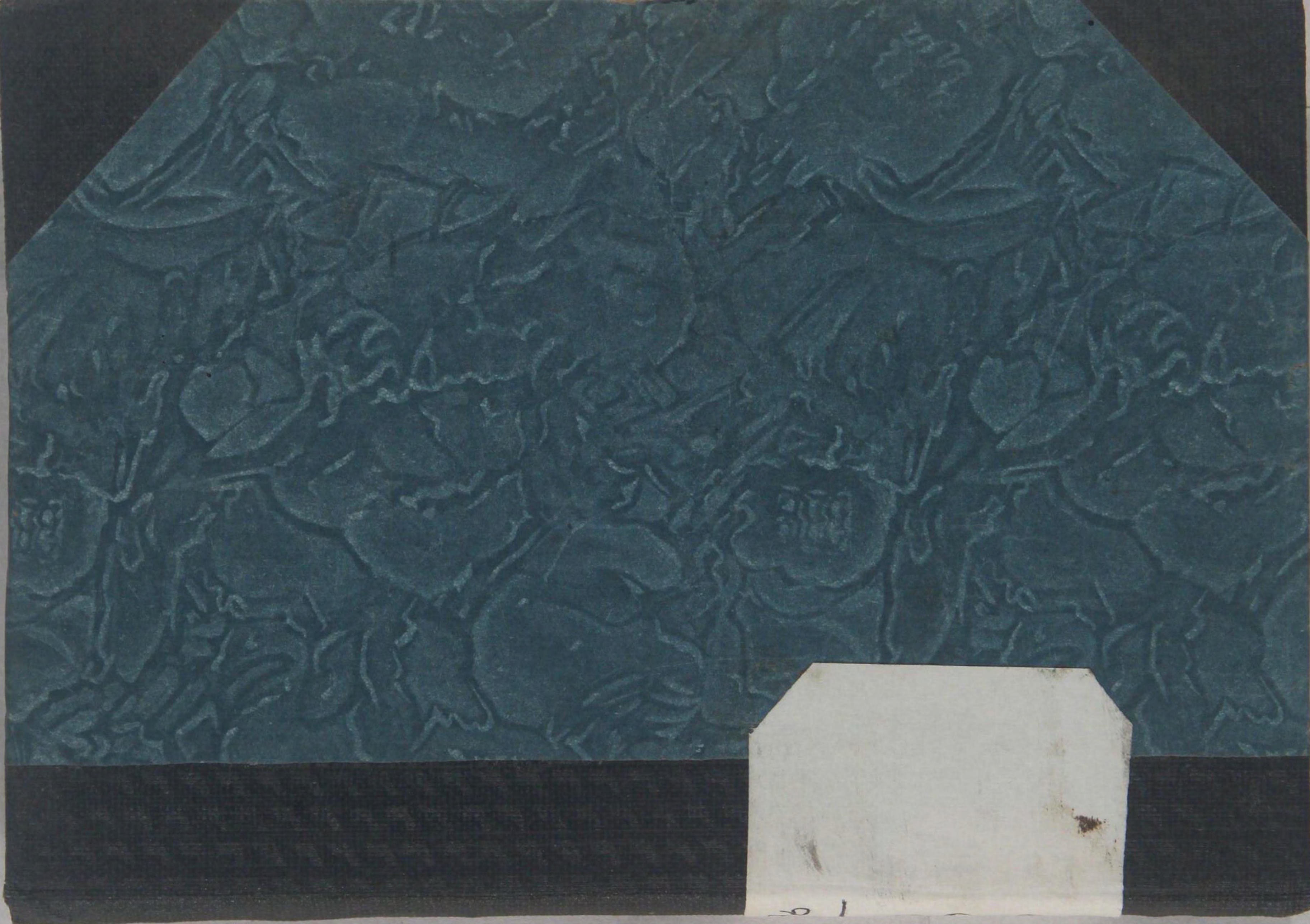

ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা

[শ্রীঅরবিন্দের A Defence of Indian Culture হইতে অনূদিত]

অনুবাদক
শ্রীঅনিলবরণ রায়

মডার্ণ বুক্ এজেন্সি
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র

প্রকাশক—

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার

৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩৯৪।৩১

শ্রীঅরবিন্দের

ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা

ভূমিকা

স্বাধীন ভারতে স্বরাজের রূপ কি হইবে, তাহা লইয়া আজকাল নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, নানা খস্‌ড়া রচিত হইতেছে। কেহ বিলাতের পার্লামেণ্টের অনুসরণ করিতে চাহেন, কেহ চাহেন রুসিয়ার ন্যায় কম্যুনিজম্, কেহ চাহেন আমেরিকার ন্যায় ফেডারেশন্; কিন্তু ভারত যে একটা অতি পুরাতন দেশ, ভারতেরও নিজস্ব রাষ্ট্রপ্রতিভা আছে, রাষ্ট্রগঠনের ধারা আছে, সে কথাটা কাহারও মনে উঠে না। ভারত যেন অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার ন্যায় একটা নূতন দেশ, এখানে কেহ কখনও রাজত্ব করে নাই, রাষ্ট্র পরিচালনা করে নাই, সাম্রাজ্য গঠন করে নাই! ভারতের সেই অতীত রাষ্ট্রনীতি এখনও ভারতবাসীর অবচেতনায় অনুস্যূত রহিয়াছে, তাই তাহারা কোন বিদেশী ধরণের অনুষ্ঠান গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। নেহরু কমিটীর নির্দ্দেশ অনুসারে কংগ্রেস যে ভারতের জন্য বিলাতের অনুকরণে পার্লামেণ্টারি গবর্ণমেণ্টের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমাদের দেশে কিছুতেই চলিবে না, এ কথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। আমরা বলিতেছি না যে, প্রাচীন ভারতে যেমন রাষ্ট্র-গঠন ও শাসনতন্ত্র ছিল, বর্ত্তমানে আবার ঠিক তাহাই

স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু, সেই জাতীয় ধারার বিকাশ করিয়াই বর্ত্তমান কালোপযোগী রাষ্ট্রের সৃজন করিতে হইবে, কেবল এই ভাবেই ভারতের অতি জটিল রাষ্ট্রনীতিক সমস্যা-সমূহের সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রনীতি কিরূপ ছিল, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Arya পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের "A Defence of 1ndian Culture" নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই শেষাংশ এখানে অনুবাদিত হইয়াছে।

—অনুবাদক

সূচীপত্র

১।	প্রাচীন ভারতে সমাজ ও রাষ্ট্র	...	১
২।	ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি ও স্বরূপ		২৫
৩।	ভারতে রাষ্ট্রবিকাশের ধারা	...	৫০
৪।	ভারতীয় ঐক্য সাধন সমস্যা	...	৮৮

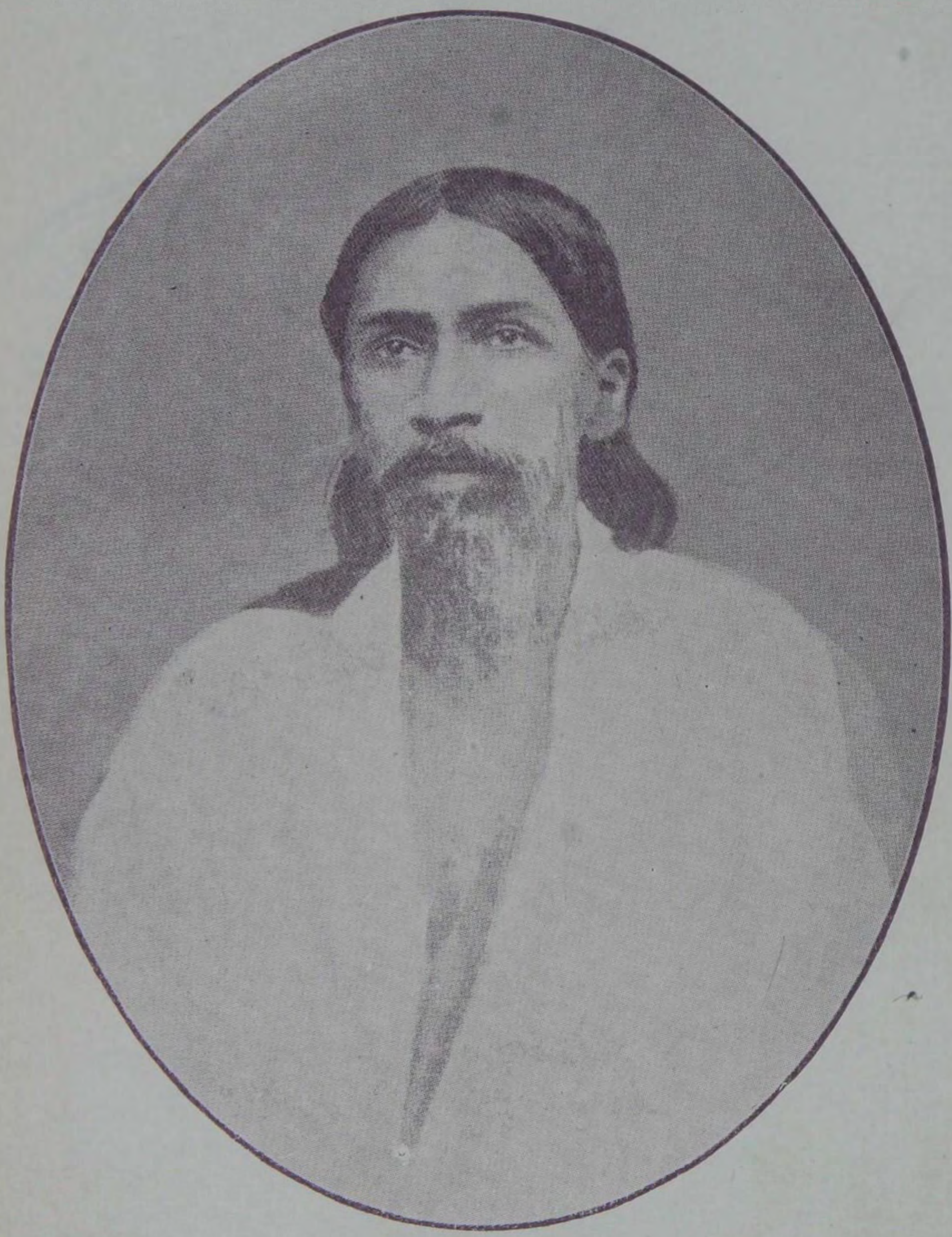

শ্রীঅরবিন্দ

প্রাচীন ভারতে সমাজ ও রাষ্ট্র

মনুষ্যত্বের উচ্চতম বিকাশের জন্য যে সকল জিনিষ প্রয়োজন, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্ম, চিন্তাশীলতা, নৈতিকতা, কলাবিদ্যা,—এই সকল বিষয়ে প্রাচীন ভারত যে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আর কোন তর্কের স্থান নাই, ভারতের বিরুদ্ধ সমালোচকরাও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই গৌরবময় ভারতীয় জীবনের যে সকল প্রমাণ ও নিদর্শন আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইতে নিঃসন্দেহেই জানা যায়, ভারতের সভ্যতা যে কেবল উচ্চ ছিল তাহা নহে, জগতে যে পাঁচ ছয়টি উচ্চতম সভ্যতার ইতিহাস আজও পাওয়া যায়, ভারতীয় সভ্যতা তাহাদেরই অন্যতম। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন, যাঁহারা আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিষয় সমূহে ভারতের উচ্চ কৃতিত্ব স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহেন যে, পার্থিব জীবনকে য়ূরোপ যেমন শক্ত, সমর্থ, উন্নতিশীলভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত করিতে পারিয়াছে, ভারত তাহা করিতে সমর্থ

হয় নাই, এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারতের মনীষিগণ সংসার-ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ ও ব্যক্তিগত মুক্তির সাধনার দিকেই ঝুঁকিয়াছিলেন। অন্ততঃ পক্ষে ভারতের সভ্যতা কতক-দূর বিকশিত হইয়া থামিয়া গিয়াছে, আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাহার মধ্যে নানা ত্রুটি ও গ্লানি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

ভারতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা আজ বড়ই বেশী করিয়া বাজিতেছে; কারণ, বর্ত্তমান যুগের মানুষ, এমন কি, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত মানুষও রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিকেই জীবনের মধ্যে প্রধান স্থান দিতেছে। আধ্যাত্মিক ও মানসিক উৎকর্ষতার কেবল ততটুকুই আদর আছে, যতখানি তাহারা রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক জীবনের সাফল্যে সহায়তা করিতে পারে। প্রাচীন যুগের মানুষরা আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্পকে যেমন একটা নিজস্ব মূল্য দিত এবং সেইগুলিকেই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষ বলিয়া গণ্য করিত, বর্ত্তমান মানুষ তাহা করিতে চাহে না। যদিও এই বর্ত্তমান বৈষয়িক মনোভাব মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে নীচ ভোগ-পরায়ণ স্বার্থপর দ্বন্দ্বপ্রবণ করিয়া তুলিয়া সংসারে নানা দুঃখ ও অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের পরিপন্থী হইতেছে, তথাপি ইহার মধ্যে এই সত্যটুকু রহিয়াছে যে, যদিও কোন সভ্যতার গুণ বিচার

করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হয় যে, মানুষের ভিতরটিকে উন্নত করিতে, তাহার মন ও আত্মাকে উন্নত করিতে তাহার ক্ষমতা কতদূর, তথাপি সে সভ্যতা পূর্ণ হয় না, যদি সে বাহ্য জীবনকেও সুষ্ঠুভাবে গঠিত করিয়া ভিতরে ও বাহিরে সামঞ্জস্য রাখিতে না পারে। উন্নতি বলিতে ইহাই বুঝায়, শুধু উপরের জিনিষেরই উৎকর্ষ-সাধন করিলে চলিবে না, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজনীতিকেও এমন ভাবে শক্ত-সমর্থ করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে জাতি জীবন-সংগ্রামে টিকিতে পারে, কেবল ব্যক্তিগত-ভাবে নহে, কিন্তু জাতিগত ভাবে পূর্ণতার দিকে নিশ্চিত-ভাবে অগ্রসর হইতে পারে, এবং বাহিরের জীবনে এমন সজীবতা ও সবলতা থাকে, যেন তাহার মধ্যে আত্মা ও মনের ক্রিয়া ক্রমশঃ উন্নতভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। যে সভ্যতা এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে না, তাহার আদর্শ বা কার্য্য-কারিতার দোষ ও ত্রুটি রহিয়াছে, সে সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ বলা চলে না।

ভারতীয় সমাজের ভিতর ও বাহির যে সকল আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা ছিল অতি উচ্চ, সমাজ-শৃঙ্খলার ভিত্তি ছিল অতি সুদৃঢ়, ইহার মধ্যে যে তেজীয়ান্ প্রাণশক্তি ক্রিয়া করিত, তাহাতে ছিল অসাধারণ সৃষ্টি-শক্তি ও ঐশ্বর্য্য; ভারত বাহিরের জীবনকে যে ভাবে গঠিত করিরাছিল, তাহাতে হইয়াছিল প্রাচুর্য্য, বৈষম্যের

মধ্যে ঐক্য, সৌন্দর্য্য, উৎপাদনশীলতা, গতি। ভারতের ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্যের যে সকল নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহাই ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ এবং ইহার অবনতির যুগেও সেই অতীত মহত্ত্বের সমস্ত চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহা হইলে ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়, ইহা বাহিরের জীবনকে খর্ব্ব করিয়াছে, তাহার কারণ কি? এই অভিযোগকে যাঁহারা বাড়াইয়া দেখান, তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার অবনতি ও ধ্বংস দেখিয়াই বিচার করেন এবং অবনতির যুগের লক্ষণগুলিই ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহাদের অভিযোগের প্রধান কথা এই যে, ভারত কখনই স্বাধীন সমর্থ রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে নাই; চিরকাল ভারত শতধা বিচ্ছিন্ন এবং তাহার সুদীর্ঘ ইতিহাসের বহুকালই ভারত পরাধীন; অতীতে তাহার অর্থনীতিক ব্যবস্থার যাহাই গুণ থাকুক, তাহা অচলায়তন হইয়া পড়ে, সময়ের প্রয়োজনের সহিত তাহা পরিবর্ত্তিত ও বিকশিত হইতে পারে নাই, ফলে বর্ত্তমান যুগে আসিয়াছে—দারিদ্র্য ও নিষ্ফলতা; বংশমর্য্যাদানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ ভারতীয় সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাহা জাতি-ভেদজর্জ্জরিত, নিষ্ঠুর অমানুষিক প্রথাসমূহে পরিপূর্ণ, অতীতের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে

ইহাকে নিক্ষেপ করা ছাড়া আর উপায় নাই, ইহার স্থানে য়ুরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার স্বাধীনতা, দক্ষতা ও পূর্ণতার আমদানী করিতে হইবে। এই সব ব্যাপারের প্রকৃত সত্য কি তাহা পূর্ব্বে জানা প্রয়োজন, তাহার পর ভারতীয় সভ্যতার রাষ্ট্রনীতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক দিকের গুণাগুণ বিচার করিলেই চলিবে।

ভারতের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতে এবং তাহার প্রাচীন অতীত সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে যে, ভারত রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে অক্ষমতা দেখাইয়াছে। বহু-কাল এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ভারত আদিম আর্য্য ও বৈদিক সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বাধীন ব্যবস্থা হইতে একেবারে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব ও অত্যাচার-পীড়িত সমাজ-ব্যবস্থায় এবং স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের অধীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় উপনীত হইয়াছিল এবং তাহার পর হইতে ভারতে এ-যাবৎ এই দুইটি ব্যবস্থাই বাহাল আছে। ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণা বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে যাহা বৈশ্য যুগ বলিয়া উক্ত, কল-কারখানার বিস্তারে ধনের জন্য কাড়াকাড়ি এবং শ্রমিকের শোষণ চলিয়াছে এবং সাধারণতন্ত্রের নামে পার্লামেণ্টারি গবর্ণমেণ্ট চলিয়াছে, ভারতের ইতিহাসে

এই industrialism ও parliamentarismএর আবির্ভাব কখনও হয় নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু যখন লোকে কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া না দেখিয়াই য়ুরোপের এই দুইটি আদর্শের প্রসংশা করিত, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ বলিয়া মনে করিত, সে দিন আর নাই। ইহাদের দোষ-ত্রুটি এখন লোকলোচনে ধরা পড়িতেছে এবং ইহাদের মাপকাঠিতে কোন প্রাচ্য সভ্যতাকে পরিমাপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। য়ুরোপে প্রচলিত সাধারণতন্ত্র ও পার্লামেণ্টারি গবর্ণমেণ্টের অনুরূপ শাসনতন্ত্র প্রাচীন ভারতেও ছিল, আমাদের দেশের কেহ কেহ ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ চেষ্টা ভ্রান্ত। প্রাচীন ভারতে সাধারণতন্ত্রের একটা ভাব খুবই প্রবল ছিল, তাহা কতকটা পার্লামেণ্টারি অনুষ্ঠানের মতই মনে হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ভারতের নিজস্ব এবং তাহা আদৌ বর্ত্তমান পার্লামেণ্টারিজ্‌ম্‌ বা সাধারণতন্ত্রের সদৃশ নহে। আর এই ভাবে যদি আমরা দেখি, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতবাসী সমাজের মানসিক ও দৈহিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইতে হয়, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন য়ুরোপের সহিত তুলনা করিয়া সে ব্যবস্থার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝা যায় না।

প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে যে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রচলিত ছিল, এবং যাহা মানব-সমাজবিকাশের এক অবস্থায় সকল দেশের মানুষের মধ্যেই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়, সেই রাষ্ট্রতন্ত্রেরই একটা বিশেষ রূপ লইয়া ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাস আরম্ভ হয়। কুল বা গোষ্ঠী লইয়াই এই তন্ত্র গঠিত ছিল এবং ইহার মূল ছিল কুল বা গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকল মনুষ্যের মধ্যে সাম্য। প্রথমাবস্থায় কোন বিশেষ স্থানে এই কুল আবদ্ধ থাকিত না, তখনও স্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া যাইবার প্রবল আগ্রহ ছিল, এবং কোন স্থানে যে কুল বাস করিত, সেই কুলের নাম অনুসারেই সেই স্থানের নাম হইত, যেমন 'কুরুদেশ' বা শুধু 'কুরু', মালব দেশ বা শুধু মালব। যখন আর্য্যদের যাযাবর প্রবৃত্তি লোপ পায় এবং তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করে, তখনও কুল বা গোষ্ঠীপ্রথা অক্ষুণ্ণ থাকে; কিন্তু তখন পল্লী-সমাজই হয় সেই রাষ্ট্রতন্ত্রের মূল আকার বা কেন্দ্র। জনসাধারণ সাম্প্রদায়িক বিষয়ের আলোচনা করিবার নিমিত্ত অথবা যজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত অথবা যুদ্ধা-য়োজনের নিমিত্ত সভায় সমবেত হইত, সেই সভার নাম ছিল "বিশা।" এই সভাই ছিল জনসাধারণের সমবেত শক্তির প্রতীক এবং বহুকাল এই সভার ভিতর দিয়াই সম্প্রদায়ের সাধারণ জীবন পরিচালিত হইত। এই সভার

শীর্ষস্থানীয় এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে ছিলেন রাজা। যখন এই রাজার পদ পুরুষানুক্রমিক হয়, তখনও বহুকাল রাজার অভিষেকে জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে অনুমোদিত ও নির্ব্বাচিত হইতে হইত। যজ্ঞরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত-শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাঁহারা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত ছিলেন এবং বাহ্যানুষ্ঠানের পশ্চাতে যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, এই ভাবেই মহান্ ব্রাহ্মণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। প্রথম প্রথম এই সকল পুরোহিত পুরুষানুক্রমিক ছিলেন না, তাঁহারা অন্যান্য বৃত্তিও অনুসরণ করিতেন এবং তাঁহারা সাধারণ জীবনে জনসাধারণেরই অনুরূপ ছিলেন। এই যে সহজ স্বাধীন স্বাভাবিক সমাজতন্ত্র, ইহাই সমগ্র আর্য্য ভারতে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

এই আদিম সমাজতন্ত্রের পরবর্ত্তী বিকাশ কতক দূর পর্য্যন্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায়ই হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এখানে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে ভারতীয় সভ্যতার রাষ্ট্রনীতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক ধারা অন্যান্য দেশ হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বংশানুক্রমনীতি অতি প্রাচীনকালেই ভারতে স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং ক্রমশঃ উহা এমন প্রাধান্য লাভ করে যে, সর্ব্বত্র সকল সঙ্ঘ ও অনুষ্ঠানের উহাই ভিত্তি

হইয়া দাঁড়ায়। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এক শক্তিশালী শাসক ও যোদ্ধৃশ্রেণীর আবির্ভাব হয়, সমাজের অবশিষ্ট লোক ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কৃষক-শ্রেণীতে বিভক্ত হয় এবং এক দাস বা সেবকশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ আর্য্যগণ যাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতেন, তাহারা ভৃত্য ও শ্রমিক হইত, তাহাদিগকে লইয়াই এই দাস-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ভারতবাসীর মনের উপর বহু প্রাচীনকাল হইতেই ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য আছে। এই জন্যই সমাজের শীর্ষভাগে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়; তাঁহারা পুরোহিত, পণ্ডিত, আইন-কর্ত্তা, বেদবিৎ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অন্যান্য দেশেও এইরূপ শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় যেমন স্থায়ী, সুনির্দ্দিষ্ট, সমুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, এমনটি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবাসীর ন্যায় যে সকল দেশের লোকের মানসিক ভাব জটিল নানামুখী নহে, সেখানে এরূপ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইলে, তাহারাই সমাজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িত। কিন্তু যদিও ব্রাহ্মণদের প্রভাব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহারাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তথাপি ভারতে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় কোন দিনই রাজশক্তিকে অধিকার করে নাই বা করিতে পারে নাই। রাজার ও জনসাধারণের

পুরোহিত, গুরু, বিধিকর্ত্তৃরূপে ব্রাহ্মণরা আশ্চর্য্য ক্ষমতা বিস্তার করিতেন বটে, কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্রশাসনের ভার কার্য্যতঃ রাজা, ক্ষত্রিয় অভিজাতসম্প্রদায় এবং জনসাধারণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল।

কিছু কাল এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ঋষি। উচ্চ অধ্যাত্ম-উপলব্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ঋষি, যে কোন শ্রেণী হইতে তাঁহার আবির্ভাব হইত, কিন্তু তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক চরিত্রের গুণে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেন, রাজা তাঁহাকে সম্মান করিতেন, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং সমাজের সেই অগঠিত অবস্থায় তিনি একাই সমাজের নূতন বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও বিকাশ করিতে সমর্থ হইতেন। ভারতীয় মনোবৃত্তির ইহা একটি বিশিষ্ট লক্ষণ যে, সকল কার্য্যে, এমন কি বাহ্যতম সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারেও ভারতবাসী আধ্যাত্মিক সার্থকতার দিকে, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে, প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম কি, কর্ত্তব্য কি, অধ্যাত্ম-জীবন-বিকাশে উপযোগিতা কি, তাহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। জাতির মনের উপর এই স্থায়ী ছাপ ঋষিগণই দিয়া গিয়াছিলেন ; ভারতীয় সভ্যতা, ভারতবাসীর শিক্ষা-দীক্ষা, জীবনের ধারা যে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং জীবনের

সকল কার্য্য, সকল চেষ্টার ভিতর দিয়া দিব্য অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশ করাই যে ভারতীয় জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হইয়াছে, তাহার মূলই এই ঋষিরা। পরবর্ত্তী কালে আমরা দেখিতে পাই, স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণরা সমাজে তৎকালে প্রচলিত রীতি-নীতি সংগ্রহ করিয়া সেই সকলকে সেই প্রাচীন ঋষিদের নামে চালাইয়া দিয়াছেন এবং এই ভাবে মনুসংহিতা, পরাশরসংহিতা প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভারতের সমাজে ও রাষ্ট্রে পরে যে পরিবর্ত্তনই হউক, এই যে মূল বৈশিষ্ট্য ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা, ইহা চিরদিনই ভারতবাসীর জীবনে ইহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং অবশেষে যখন উহা প্রাণহীন বিধিনিষেধ ও আচার-ব্যবহারে পরিণত হয়, তখনও প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সর্ব্বদাই জীবন্তভাবে পরিস্ফুট হইবার চেষ্টা করিয়াছে।

রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া সেই আদিম ব্যবস্থার বিকাশ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় এই বিকাশের সাধারণ গতি হইয়াছে রাজতন্ত্রের দিকে, রাষ্ট্রের শাসন ও পরিচালন-কার্য্য ক্রমশঃ জটিল হইয়াছে এবং কেন্দ্ররূপে রাজাই এই শাসনতন্ত্রের অধিপতি হইয়াছেন; রাষ্ট্রের এই রাজতন্ত্র রূপ কালক্রমে প্রচলিত এবং সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু এক বিপরীত প্রচেষ্টা এই রাজতন্ত্রের বিস্তারকে বহু দিন বাধা দিয়া আটক করিয়া রাখিয়া-

ছিল, এবং এই প্রচেষ্টার ফলে নানাস্থানে নাগরিক বা প্রাদেশিক গণতন্ত্রের (Republics) আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সকল ক্ষেত্রে রাজা বংশানুক্রমিক বা নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্টরূপে পরিণত হন অথবা কোথাও রাজার অস্তিত্বই একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হয়। জনসাধারণের সভার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ফলেই কোথাও কোথাও এই সব গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল, আবার কোথাও বা প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া গণতন্ত্রের স্থাপনা করিয়াছিল, রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ক্রমাগত ভাগ্য-বিপর্য্যয়ও হইয়াছিল। ভারতের কোন কোন জাতির মধ্যে গণতন্ত্রই শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করে এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত রাষ্ট্রশাসন পরিচালিত করিয়া শত শত বৎসর অক্ষুন্ন থাকে। সেগুলি কোথাও লোকতান্ত্রিক সভার দ্বারা আবার কোথাও মুখ্যতান্ত্রিক পরিষদের দ্বারা শাসিত হইত। দুঃখের বিষয় এই সকল ভারতীয় গণতন্ত্রের সংগঠন প্রণালী আমরা খুব কমই জানি এবং তাহাদের অভ্যন্তরীন ইতিহাস আমরা কিছুই অবগত নহি। তবে তাহাদের শাসন প্রণালীর উৎকর্ষতা এবং তাহাদের সামরিক ব্যবস্থার দুর্ব্বার দক্ষতার খুবই সুখ্যাতি যে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধের একটি কথা প্রচলিত আছে, তিনি বলিয়াছিলেন, যত দিন গণতন্ত্রের

অনুষ্ঠানগুলি ঠিকভাবে পরিচালিত হইবে, তত দিন এরূপ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও মগধ-রাজবংশের উদ্ধত সামরিক শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারিবে। এই মতের আরও সমর্থন পাওয়া যায় ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্রনীতিক গ্রন্থকারদের রচনায়, তাঁহাদের মতে,—গণতন্ত্র রাষ্ট্রের সহিত সখ্য স্থাপন করিলে রাজারা রাজনীতিক ও সামরিক ব্যাপারে যেমন সাহায্য পাইবেন, এমন আর অন্য কোথাও পাইবেন না ; গণতন্ত্রকে দমন করিবার উপায় যুদ্ধ নহে, তাহাদের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হওয়ার আশা অতি অল্প। তাহাদিগকে দমন করিতে হইলে কূট রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাদের রাষ্ট্রতন্ত্রের ঐক্য ও দক্ষতা ভিতর হইতে নষ্ট করিয়া দিতে হইবে, নতুবা তাহাদিগকে দমন করা সহজ ব্যাপার নহে।

ভারতের এই সকল গণতন্ত্র (Republics) বহু প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে তেজের সহিত পরিচালিত হইতেছিল। অতএব, গ্রীস্ দেশে যখন ক্ষণস্থায়ী বিব্রত গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়, তখন ভারতবর্ষে এই সকল গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল, এবং গ্রীসের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার বহুকাল পর পর্য্যন্ত ভারতে বর্ত্তমান ছিল। ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্ত্তী চপল অস্থিরমতি জাতিসকল অপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয়গণ যে সুদৃঢ় ও স্থায়ী রাষ্ট্রগঠন-ব্যাপারে

উন্নত ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতের কোন কোন গণতন্ত্র প্রাচীন রোম অপেক্ষা দীর্ঘকাল তেজের সহিত আপনাদের স্বাধীনতা ভোগ ও রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল ; কারণ, তাহারা চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের প্রবল-প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও আপনাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল এবং খৃষ্টের মৃত্যুর পরে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তাহারা কেহই গণতন্ত্র রোমের ন্যায় অপরকে আক্রমণ ও জয় করিবার শক্তির এবং বিস্তৃতভাবে সঙ্ঘগঠনের শক্তির অনুশীলন করে নাই ; তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, স্বাধীনভাবে আপনাদের জীবন-বিকাশ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। আলেক্‌জান্দারের আক্রমণের পর ভারত সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল এবং তখন ঐ গণতন্ত্রগুলি মিলনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। আপনাদের মধ্যে তাহারা শক্তিমান ছিল, কিন্তু সমস্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য তাহারা কিছু করিতে পারে নাই। ছোট ছোট রাষ্ট্র মিলিয়া সমস্ত ভারতকে সঙ্ঘবদ্ধ করা বড় সহজ-ব্যাপার নহে,—বস্তুতঃ প্রাচীনকালে জগতের কোথাও এরূপ চেষ্টা সফল হয় নাই, কতক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধতা সর্ব্বত্রই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং কেন্দ্রীভূত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই দাঁড়াইতে পারে নাই। জগতের অন্যান্য স্থানের

ন্যায় ভারতবর্ষেও রাজতন্ত্রই ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং অবশেষে অন্যান্য প্রকারের রাষ্ট্রতন্ত্রকে স্থানচ্যুত করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের ইতিহাস হইতে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়, তাহাদের কথা আমরা এখন জানিতে পারি কেবল প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে, গ্রীস্‌দেশীয় পর্য্যটকদের বর্ণনা হইতে এবং সেই সকল সমসাময়িক গ্রন্থকারদের লেখা হইতে, যাঁহারা ভারতের সর্ব্বত্র রাজতন্ত্রস্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন।

যদিও ভারতে রাজা ভগবানের প্রতিনিধি এবং ধর্ম্মের রক্ষকরূপে পরিগণিত হইতেন, রাজার পদ, সম্মান, শক্তি উচ্চশিখরে অবস্থিত ছিল, তথাপি মুসলমানদের ভারতে আসিবার পূর্ব্বে, ভারতে কোনরূপ স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ছিল না, রাজা ইচ্ছামত যাহা তাহা করিতে পারিতেন না। প্রাচীন পারস্যদেশে, মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ায়, অথবা রোমক সাম্রাজ্যে বা পরবর্ত্তী য়ুরোপে যে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, ভারতের রাজতন্ত্র ছিল তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; পাঠান ও মোগলসম্রাটগণ ভারতে যে রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তন করেন, ভারতীয় রাজতন্ত্রের সহিত তাহার কোনই সাদৃশ্য ছিল না। ভারতের রাজা দেশ-শাসন ও বিচারকার্য্যে সকলের উপরে ছিলেন, দেশের সমস্ত সামরিক শক্তি তাঁহার হস্তে ছিল, এবং তাঁহার মন্ত্রণাপরিষদের সহযোগিতায় তিনিই যুদ্ধ বা শান্তিস্থাপনের

সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তিনি সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, সমাজের কল্যাণ সম্বন্ধেও তিনি সাধারণভাবে দেখাশুনা করিতেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না; তাহা ছাড়া তিনি যাহাতে তাঁহার ক্ষমতার কোনরূপ অপব্যবহার করিতে না পারেন, তাহারও নানা ব্যবস্থা ছিল এবং দেশের অন্যান্য সাধারণ অনুষ্ঠানও আপন আপন ভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিত, রাজ্য-শাসনব্যাপারে তাহাদেরও অনেক ক্ষমতা ছিল, তাহারা একরূপ রাজার সহিত সহযোগেই রাজকার্য্য, দেশশাসন-কার্য্য পরিচালনা করিত। ইংরাজীতে যাহাকে বলে A limited or constitutional monarch,—আইনের অধীন সীমাবদ্ধ-শক্তিসম্পন্ন রাজা, ভারতের রাজা বস্তুতঃ তাহাই ছিলেন; তবে ভারতে যে ভাবে constitution আইনানুমোদিত শাসনতন্ত্র রক্ষিত হইত এবং রাজার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হইত, য়ুরোপের ইতিহাসে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং ভারতের রাজাকে রাজত্ব চালাইতে হইলে প্রজাগণের ইচ্ছা ও সম্মতির উপর যতখানি নির্ভর করিতে হইত, মধ্যযুগে য়ুরোপীয় নৃপতিগণকে ততখানি নির্ভর করিতে হইত না।

রাজার উপরেও রাজা ছিল ধর্ম্ম। যে সব আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক, বিচারগত, আচারগত রীতি-নীতি আইন-কানুন জাতির জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে

পরিচালিত করে, তাহাদের সমষ্টিকেই ভারতে সাধারণ-ভাবে ধর্ম্ম বলা হয়। রাজা ছিলেন এই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অধীন। এই ধর্ম্মকে লোক অতি পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিত এবং ইহার আধিপত্য নিত্য, সনাতন বলিয়া পরিগণিত হইত। মূলতঃ এই ধর্ম্মের কোনই পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তবে সমাজের ক্রমবিকাশে ইহার রূপের, বাহ্য আকারের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও স্বতঃই ভিতর হইতে স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে। দেশভেদে, কুলভেদে যে বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, তাহাও এই মূল ধর্ম্মেরই অন্তর্গত। এই ধর্ম্মের উপর ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। ব্রাহ্মণরাও ছিলেন এই ধর্ম্মের শিক্ষক, প্রচারক। ধর্ম্মকে তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন মাত্র, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। ইচ্ছামত ধর্ম্মের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার তাঁহাদেরও ছিল না। তবে অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবার অধিকার যখন তাঁহাদের ছিল, তখন তাঁহারা নিজস্ব ব্যাখ্যার দ্বারাই সমাজের নানা নূতন ভাব, নূতন চেষ্টার সমর্থন বা বিরোধিতা করিতে পারিতেন। রাজা ছিলেন ধর্ম্মের কেবল রক্ষক, পরিচালক, ভৃত্য। তাঁহার উপর ভার ছিল, যেন লোক ধর্ম্ম মানিয়া চলে, কেহ কোনও অপরাধ না করে, যেন বিষম বিশৃঙ্খলা বা ধর্ম্মভঙ্গ না

হয়। প্রথমে রাজাকে নিজেই সেই ধর্ম্ম মানিতে হইত, রাজা ব্যক্তিগতভাবে কিরূপ জীবন যাপন করিবেন এবং রাজপদ, রাজকার্য্যও কিরূপে পরিচালনা করিবেন, সে সম্বন্ধে ধর্ম্মের যাহা নির্দ্দেশ, রাজাকে কড়াকড়িভাবেই তাহা পালন করিতে হইত।

রাজশক্তির পক্ষে এই যে ধর্ম্মের আনুগত্য, ইহা কেবল একটা বাস্তববর্জ্জিত কাল্পনিক আদর্শমাত্র ছিল না, কেবল কথার কথা ছিল না। কারণ, সমস্ত সমাজ-জীবন বস্তুতঃ ধর্ম্মের নির্দ্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হইত। অতএব উহা ছিল জীবন্ত সত্য এবং সেই জন্যই রাজনীতিক ক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব ছিল সমধিক। প্রথমতঃ, আইন প্রণয়ন করিবার কোন শক্তি রাজার ছিল না; দেশশাসনকার্য্যে রাজা যে সব আদেশ ও অনুশাসন প্রচার করিতেন, সে সব দেশের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থ-নীতিক রীতিনীতিরই অনুযায়ী হইত,—এমন কি, এই সব আদেশপ্রচারকার্য্যও রাজা একাকী করিতেন না। দেশের মধ্যে অন্যান্য এমন শক্তি ও অনুষ্ঠান ছিল, যাহারা রাজ্য-শাসনব্যাপারে আদেশাদি প্রচার করিবার ক্ষমতায় রাজার সহিত অংশীদার ছিল—তাহা ছাড়া রাজা যে ভাবে দেশ শাসন করিতেন, ফলতঃ তাহা দেশবাসীর প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত ইচ্ছা কর্ত্তৃক অনুমোদিত কি না, সব সময়েই রাজাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই চলিতে হইত।

আধ্যাত্মিক সাধনা পূজা উপাসনা প্রভৃতি ব্যাপারে সাধারণকে স্বাধীনতা দেওয়া ছিল; সাধারণতঃ এ সব ব্যাপারে রাজা কোন ব্যতিক্রম করিতে পারিতেন না। প্রত্যেক ধর্ম্ম-সঙ্ঘ, প্রত্যেক নূতন বা বহুকালব্যাপী ধর্ম্মসম্প্রদায়—আপনার জীবন, আপনার অনুষ্ঠান আপনার মত করিয়া স্বাধীনভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিত। তাহাদের নিজ নিজ গুরু ছিল, অধিপতি ছিল, আপন আপন ক্ষেত্রে তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত চলিতে পারিত। State religion, রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম বলিয়া কোন বিশেষ ধর্ম্মমত পরিগণিত হইত না। ধর্ম্মব্যাপারে রাজা জাতির অধিপতি ছিলেন না। এই বিষয়ে দেখা যায় যে, অশোক দেশের ধর্ম্মের উপরে রাজশক্তির প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অন্যান্য শক্তিশালী নরপতিগণও মাঝে মাঝে এইরূপ প্রবৃত্তি কিছু কিছু দেখাইয়াছেন। কিন্তু, ধর্ম্মসম্বন্ধে অশোকের edicts বা ঘোষণাপত্র বলিয়া যেগুলি পরিচিত, সেগুলি ঠিক রাজাজ্ঞা নহে, কেবল রাজার মতপ্রকাশ মাত্র, লোককে তাহা যে গ্রহণ করিতেই হইবে, এরূপ আদেশ ছিল না। যদি কোন রাজা ধর্ম্মমতের বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেন, তবে তাঁহাকে তৎপূর্ব্বে এ বিষয়ে প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের মত গ্রহণ করিতে হইত, অথবা পরামর্শের

জন্য বিচার-সভা আহ্বান করিতে হইত [বৌদ্ধগণের প্রসিদ্ধ বিচারসভাসমূহ ইহার দৃষ্টান্ত], অথবা বিভিন্ন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে তর্ক ও বিচারের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইত এবং যাহা সিদ্ধান্ত হইত, তাহাই গ্রহণ করা হইত। রাজা ব্যক্তিগতভাবে কোনও বিশেষ মতবাদের পক্ষপাতী হইলে ঐ মতবাদের প্রচারে খুবই সুবিধা হইত বটে, কিন্তু রাজা হিসাবে তাঁহাকে সকল প্রচলিত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই সম্মান ও সমর্থন করিতে হইত এবং এ বিষয়ে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ থাকিতে হইত। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ সম্রাট্‌গণ দুইটি বিরোধী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কেই সমর্থন করিয়াছিলেন। কখনও কখনও, বিশেষতঃ দক্ষিণ-দেশে, রাজা কর্ত্তৃক ধর্ম্মব্যাপারে কম-বেশী অত্যাচার সাধিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা অধর্ম্মের লক্ষণ, ব্যাভিচার, সাময়িক তীব্র উত্তেজনার ফল, ইহা কখনই বহুদূরব্যাপী বা বহুকাল-স্থায়ী হয় নাই। সাধারণতঃ ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রথায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে অসহনীয়তা বা অত্যাচারের স্থান ছিল না, এবং কোনও রাজা বা রাষ্ট্র যে ইহা নীতিস্বরূপ অনুসরণ করিবে, ইহা ছিল কল্পনারও অতীত।

যেমন ধর্ম্মব্যাপারে, তেমনই সামাজিক ব্যাপারেও লোকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইত না। রাজা আইন করিয়া সমাজের বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন,

এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায় না। যখন এরূপ হইয়াছে, তখন যাহাদের জন্য পরিবর্ত্তন—তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহাদের মত লইয়াই করা হইয়াছে। বহুকাল বৌদ্ধ-প্রভাবে বাঙ্গালা দেশে জাতিভেদ বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবার পর সেনরাজগণ যখন পুনরায় জাতিভেদের প্রবর্ত্তন করেন, তখন এই ভাবে লোকের সহিত পরামর্শ করিয়াই করিয়াছিলেন। সমাজের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন ইচ্ছামত উপর হইতে করা হইত না, কিন্তু ভিতর হইতে স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইত; কুল বা বংশকে অথবা বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়কে আপন আপন আচারের পরিবর্ত্তন ও বিকাশ করিতে যে স্বাধীনতা দেওয়া ছিল, প্রধানতঃ সেই স্বাধীনতার ফলে ভিতর হইতেই স্বাভাবিক-ভাবে সমাজের পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইত।

রাজ্যশাসন-ব্যাপারেও এইরূপেই রাজার শক্তি জাতির সনাতন আদর্শের দ্বারা, ধর্ম্মের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধান প্রধান রাজস্ব-ব্যাপারে রাজা এক নির্দ্দিষ্ট অংশের বেশী কর ধার্য্য করিতে পারিতেন না; অন্যান্য ব্যাপারে জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক অনুষ্ঠানের মত লইয়াই রাজাকে কর নির্দ্ধারণ করিতে হইত এবং সকল সময়েই ইহা সাধারণ নীতি ছিল যে, রাজার যে দেশ শাসন করিবার অধিকার, তাহার ভিত্তি হইতেছে জনসাধারণের সন্তোষ ও সম্মতি। আমরা দেখিব যে, এটি কেবলমাত্র একটি

সদিচ্ছা বা ধর্ম্মবেত্তা ব্রাহ্মণগণের মত মাত্র ছিল না। রাজা নিজে ছিলেন প্রধান বিচারপতি, দেশের দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইন অনুসারে দণ্ডাদি দিবার ব্যাপারে সকলের উপরে রাজারই আধিপত্য ছিল। তাঁহার বিচারপতিরা বা আইনে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণরা আইনের যে স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন, সেই নির্দ্ধারণ যথাযথভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি বাধ্য ছিলেন। মন্ত্রণাপরিষদে কেবল বিদেশীদের সহিত সম্পর্কে, সামরিক নীতি এবং যুদ্ধ ও শান্তিস্থাপন ব্যবস্থায় এবং বহু পরিচালন-মূলক্ কর্ম্মে রাজাই ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা—সকলের উপরে। যে সব শাসনকর্য্যের দ্বারা সমাজের সাধারণ কল্যাণ হয়,—যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও রক্ষণ এবং সামাজিক দুর্নীতি-নিবারণ,—এবং এইরূপ যে সব ব্যাপার রাজার দ্বারাই সুচারুভাবে পরিচালিত হইতে পারে, সেই সব ব্যাপারে ইচ্ছামত সুব্যবস্থা করিবার তাঁহার পূর্ণ অধিকার ছিল। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে না যাইয়া তিনি কাহাকেও অনুগ্রহ, কাহাকেও নিগ্রহ করিতে পারিতেন, তবে যাহাতে জনসাধারণের সাধারণ কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হয়, একান্তভাবে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহাকে এই সব করিতে হইত।

অতএব, প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারী রাজার খেয়াল বা অত্যাচারের কোন স্থান ছিল না; অন্যান্য অনেক দেশের ইতিহাসে রাজাদের যে পাশবিক নিষ্ঠুরতা,

নৃশংস অত্যাচার সাধারণ ব্যাপার, ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহার সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। তথাপি রাজার পক্ষে ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া এবং রাজ্যশাসন-ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠা অসম্ভব ছিল না। তাই আইন-কর্ত্তৃগণ এই অত্যাচারের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজপদের পবিত্রতা ও মর্য্যাদা সত্ত্বেও বিহিত হইয়াছিল যে, রাজা যখন যথাযথভাবে ধর্ম্মের অনুসরণ না করিবে, তখন তাহাকে মান্য করিতে প্রজারা বাধ্য নহে। মনু এমন পর্য্যন্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, অন্যায়-পরায়ণ অত্যাচারী রাজাকে পাগ্‌লা কুকুরের ন্যায়ই হত্যা করা প্রজাগণের কর্ত্তব্য। চরমক্ষেত্রে এই যে রাজদ্রোহ—এমন কি, রাজহত্যারও বিধান মনুর ন্যায় শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থে বিহিত হইয়াছে, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, রাজাকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া এবং সকল অবস্থাতেই রাজার ভগবদ্দত্ত অধিকার স্বীকার করা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় নীতির কোন বিধান নহে। এইরূপ বিদ্রোহের অধিকার প্রজারা যে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা সাহিত্যে এবং ইতিহাসেও দেখিতে পাই। আর এক-প্রকার অধিকতর নিরুপদ্রব এবং আরও অধিক প্রচলিত পন্থা ছিল,—রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ভয়প্রদর্শন করা। অনেক ক্ষেত্রে ইহার দ্বারাই অত্যাচারী রাজার সদ্‌বুদ্ধি ফিরিয়া আসিত। সপ্তদশ শতাব্দীতেও দক্ষিণদেশে

এক জন অপ্রিয় রাজাকে সাধারণে এইরূপ রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ভয় দেখাইয়াছিল ; জনসাধারণের সভায় ঘোষিত হইয়াছিল যে, রাজাকে কেহ কোনরূপ সাহায্য করিলে বিশ্বাসঘাতকতা হইবে। তবে আরও একটি প্রচলিত প্রতীকার ছিল,—মন্ত্রিগণের পরিষদ্ অথবা জনসাধারণের পরিষদ্ কর্ত্তৃক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করা। এইরূপে ভারতে যে রাজতন্ত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহা কার্য্যতঃ ছিল সংযত, কার্য্যকুশল এবং কল্যাণকর। যে কার্য্যের ভার ইহার উপর অর্পিত ছিল, তাহা সুচারুভাবেই সম্পাদিত হইত এবং স্থায়ীভাবে ইহা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাই হউক, রাজতন্ত্র ছিল কেবল এক প্রকারের রাষ্ট্রতন্ত্র। ইহা লোকানুমোদিত ও প্রভাব-সম্পন্ন ছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্রেরও অস্তিত্ব হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ-গঠনের রাজতন্ত্রই অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। আমরা যদি রাজতন্ত্রের আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই, তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার যাহা মূলনীতি, তাহা ধরিতে পারিব না। রাজতন্ত্রের পশ্চাতে ভিত্তিস্বরূপ কি ছিল, তাহার সন্ধান করিলেই ভারতের রাষ্ট্রগঠনের মূলস্বরূপ আমাদের গোচর হইবে।

ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মূলনীতি ও স্বরূপ

ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে, এটিকে স্বতন্ত্রভাবে, জাতির চিন্তাধারা ও জীবনের অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখিলে চলিবে না, সমাজ-জীবনের একটি অঙ্গরূপেই রাষ্ট্রকে দেখিতে হইবে।

একটি জাতি, একটি মহান্ মানবসমষ্টি বস্তুতঃ একটি জীবন্ত সত্তার ন্যায় (An organic living being), তাহার এক সমষ্টিগত বা সাধারণ আত্মা আছে, মন আছে, শরীর আছে। ব্যক্তির দৈহিক জীবনের ন্যায় সমাজ-জীবনকেও জন্ম, বিকাশ, পরিণতাবস্থা, অবনতি, এই সব অবস্থান্তরের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। যদি এই শেষ অবস্থা অধিক দূর অগ্রসর হয়, অবনতি ও ক্ষয়ের গতিকে রুদ্ধ করা না যায়, তাহা হইলে যেমন মানুষ বার্দ্ধক্যের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তেমনই জাতিকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। এই ভাবেই ভারত ও চীন ব্যতীত জগতের আর সব পুরাতন জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সমষ্টিগত সত্তার এমন শক্তিও আছে যে, সে নিজেকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে, ধ্বংসমুখ

হইতে রক্ষা পাইয়া আবার নূতন জীবন আরম্ভ করিতে পারে। কারণ, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একটি মূলভাব ও আদর্শ ক্রিয়া করিতেছে, জাতির দেহের ন্যায় সেটি সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না; এই আদর্শ যদি যথেষ্ট শক্তিশালী, উদার ও প্রেরণাময় হয় এবং লোকের মনে ও প্রকৃতিতে যদি তেজ থাকে, প্রাণ থাকে, নমনীয়তা থাকে, যাহার দ্বারা রক্ষণশীলতার সহিত সর্ব্বদা বিকাশ ও বৃদ্ধির সামঞ্জস্য করিতে পারে, জাতীয় আদর্শকে নূতন অবস্থার মধ্যে নূতনভাবে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে সে জাতি চরম ধ্বংসে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বহুবার পতন অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়া যাইতে পারে; তাহা ছাড়া ঐ যে জাতীয় ভাব ও আদর্শ, উহা জাতির সমষ্টিগত সত্তারই আত্মপ্রকাশের ধারা; আবার প্রত্যেক সমষ্টিগত আত্মা এক মহত্তর নিত্য সনাতন আত্মার অভিব্যক্তি ও প্রকাশের কেন্দ্র, সেই সনাতন আত্মা যুগে যুগে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে এবং মানবজাতির পতন ও অভ্যুদয়ের ভিতর দিয়া মানব-সমাজের মধ্যে নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকট করিতে চাহিতেছে। অতএব যে-জাতি কেবল বাহিরের স্থূল জীবনের মধ্যেই বাস করে না, এমন কি, যে-মূল জাতীয় ভাব তাহার বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং জাতিকে বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ব, বিশিষ্ট প্রকৃতি প্রদান করে, কেবল সেই

মূল ভাবটিকেই ধরিয়া থাকে না, কিন্তু ইহাদের পশ্চাতে যে আত্মা রহিয়াছে, অধ্যাত্মসত্তা রহিয়াছে—তাহার সন্ধান পায় এবং সেই নিগূঢ় আত্মসত্তার মধ্যে সজ্ঞানে বাস করিতে শিখে, সে জাতিকে ধ্বংস পাইতে হয় না, অপরের সহিত মিশিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে অথবা এক নূতন জাতির জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণভাবে লয় পাইতে হয় না, পরন্তু সে নিজেই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া নিজের উচ্চতম স্বাভাবিক বিকাশসাধন করিতে পারে এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পুনঃ পুনঃ নবজীবন লাভ করিতে পারে। যদিই বা কোন সময়ে মনে হয়, এইবার বুঝি তাহার পূর্ণ ধ্বংস আসন্ন, তখনও সে আত্মার শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারে এবং হয় ত আরও এক অধিকতর গৌরবের যুগ আরম্ভ করিতে পারে। ভারতের ইতিহাস এইরূপই একটি জাতির ইতিহাস।

যে মূল ভাব ভারতবাসীর জীবন, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক আদর্শসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহা হইতেছে—মানুষের প্রকৃত সত্তার, আত্মার সন্ধান করা এবং জীবনকে এমনভাবে কাজে লাগান, যেন জীবনের ভিতর দিয়াই মানুষ আত্মাকে লাভ করিতে পারে, অজ্ঞান প্রাকৃত জীবন হইতে উঠিয়া দিব্য অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; অবশ্য দেহ, প্রাণ, মনের যে

নীচের প্রাকৃত জীবন, তাহার স্ফূর্ত্তি ও বিকাশসাধন করিয়াই মানুষের অধ্যাত্মজীবন লাভ করা সম্ভব। সকলের উপর এই যে অধ্যাত্ম আদর্শ, ভারত ইহা কখনও বিস্মৃত হয় নাই, যদিও রাষ্ট্র ও সমাজের গঠনে অনেক সময়েই বহু বাহ্য পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু সমাজ-জীবনকে মানুষের প্রকৃত আত্মার অভিব্যক্তি করিয়া তোলা, মানুষের মধ্যে যে অধ্যাত্মসত্তা রহিয়াছে সমাজের বাহ্যজীবনে তাহার কোন শ্রেষ্ঠ বিকাশসাধন করা সাতিশয় কঠিন ; ধর্ম্ম, চিন্তাসম্পদ, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি মনের ব্যাপারে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ করা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী সহজ এবং যদিও এই সকল বিষয়ে ভারত অতি উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিয়াছিল, বাহ্য সামাজিক জীবনে আত্মার নিতান্ত আংশিক প্রকাশ করা এবং নিতান্ত অসম্পূর্ণ পরীক্ষা করা ছাড়া আর বেশী কিছু করা সম্ভব হয় নাই। নানা রূপকের (Symbolism) ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিকতার সাধারণ প্রভাব, জীবনের সকল স্তরে অধ্যাত্ম লক্ষ্যের স্পর্শ, সমাজ-জীবনের একটি বিশিষ্ট ছাঁচ, অধ্যাত্ম আদর্শের অনুকূল অনুষ্ঠানসমূহের সৃষ্টি—কেবলমাত্র এইগুলিই কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছিল। ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষায় অর্থ ও কাম মানব-জীবন ও কর্ম্মের দুইটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল

এবং রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ঐ দুইটি উদ্দেশ্যসাধনের স্বাভাবিক ক্ষেত্র। জীবনের এই বাহ্য দিকে উচ্চতর নীতি বা **ধর্ম্মকে** কেবল আংশিকভাবে আনা ছাড়া আর বেশী কিছু কোথাও সম্ভব হয় নাই এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম্মের স্থান খুবই অল্প ছিল। কারণ, নীতিধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া রাজনীতিক কার্য্যপরিচালনের চেষ্টা সাধারণতঃ একটা ছল ভিন্ন আর বেশী কিছু নহে। মানবজাতির অতীত ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত সমষ্টিগত বাহ্য জীবনের সহিত মোক্ষ বা মুক্ত অধ্যাত্মজীবনের প্রকৃত সংযোগ বা সমন্বয় সাধন করা আদর্শ হিসাবেও কোথাও গৃহীত বা অনুসৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া ত দূরের কথা। মানুষ এখনও তদুপোযোগী পরিণত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতে মোক্ষলাভের সাধনা ব্যক্তিগত জীবনেরই উচ্চতম সাধনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, কিন্তু সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনীতিক * জীবন-ধারাকে ধর্ম্মের † দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, আধ্যাত্মিক সার্থকতাকে কেবল ছায়ার মত পশ্চাতে রাখা হইয়াছে; ভারতের প্রাচীন সমাজ

---

* জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা রাজনীতিকে ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

† ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা এক জিনিষ নহে, সাধারণতঃ এই দুইটিকে গোলমাল করিয়া একই মনে করা হয়।

ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তবে এই চেষ্টাটুকু সে ছাড়ে নাই, ধৈর্য্যের সহিত ইহাতে লাগিয়াছিল এবং ইহা হইতেই ভারতের সমাজব্যবস্থা নিজের এক বিশিষ্ট ধরণ লাভ করিয়াছে। ভারতের যে পুরাতন আদর্শ, আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবনের সমন্বয় করা, গভীরতর অধ্যাত্ম সত্যের উপরে মানুষের সমষ্টিগত সত্তার জীবন ও কর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা, আমাদের জীবনের যে সকল অধ্যাত্ম সম্ভাবনা এখনও প্রকট হয় নাই, তাহাদের উপরে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই ভাবে জাতির জীবনকে অধ্যাত্মভাবে গড়িয়া তোলা, যেন তাহা হয় সমগ্র মানব জাতির মহত্তর আত্মার লীলা, বিরাট বিশ্বপুরুষের একটি সচেতন সমষ্টিগত সত্তা ও শরীর—এই আদর্শ ও লক্ষ্য হয় ত ভবিষ্যৎ ভারতকেই সফল করিয়া তুলিতে হইবে, লক্ষ্যকে আরও পূর্ণ ও প্রসারিত করিয়া, পূর্ণতর অভিজ্ঞতা, আরও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতই এই ভাবে অধ্যাত্ম সত্যের উপর সমষ্টিগত সমাজ-জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থার সহিত য়ুরোপের পার্থক্য হইয়াছে এবং যাহার জন্য ভারতের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা-দীক্ষার ন্যায় রাষ্ট্রজীবনকেও পাশ্চাত্য আদর্শ

(Standards) অনুসারে বিচার করা চলে না। মানব-সমাজকে পূর্ণতম বিকাশের অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে ক্রমবিকাশের তিনটি স্তরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। প্রথমটি হইতেছে সেই অবস্থা, যখন সমাজের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মসমূহ তাহার স্বাভাবিক জীবনলীলা হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইতেছে। তখন সমাজের সকল বিকাশ, সকল গঠন, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান জীবনের স্বাভাবিক বিন্যাসে সংবৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, সে সকলের প্রেরণা আসিতেছে প্রধানতঃ সমাজ-জীবনের মগ্নচৈতন্যের স্তর হইতে ; সজ্ঞানে ইচ্ছা করিয়া করা না হইলেও আপনা হইতেই সে সকলের ভিতর দিয়া জাতির সমষ্টিগত মনস্তত্ত্ব, প্রকৃতি, শরীর ও প্রাণের প্রয়োজন প্রকাশিত হইতেছে, সে সব টিকিয়া থাকিতেছে বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে কতকটা ভিতরের প্রেরণার চাপে, কতক সমষ্টিগত মন ও প্রকৃতির উপরে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। এই স্তরে এখনও লোকে সজ্ঞান বিচার-বুদ্ধি পরিচালনা করিবার মত সচেতন (Self-Conscious) হইয়া উঠে নাই, সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করিতে শিখে নাই এবং সমষ্টিজীবনকে বিচার বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে না, পরন্তু প্রাণের সহজোপলব্ধি অনুসারে জীবন যাপন করে। অন্যান্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের জনসঙ্ঘের (communities) ন্যায় ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের

প্রথম কাঠামো এইরূপ অবস্থাতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল ; পরে যখন সামাজিক আত্মচেতনা জাগিয়া উঠিতে থাকে, তখনও সেই প্রাথমিক কাঠামো বর্জ্জিত হয় নাই, কেবল আরও সুগঠিত, পরিবর্দ্ধিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, অতএব তাহা রাজনীতিক আইনকর্ত্তা বা সমাজনেতৃগণের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। সকল সময়েই তাহা ছিল দৃঢ়ভাবে স্থিতিশীল প্রাণবান্ সমাজতন্ত্র, ভারতবাসীর মন, সহজাত সংস্কার ও প্রাণের সহজোপলব্ধির পক্ষে স্বাভাবিক।

সমাজবিকাশের দ্বিতীয় স্তর আসে তখন, যখন জাতির সমষ্টিগত মন ক্রমশঃ অধিকতর বুদ্ধিতে সচেতন হয় প্রথমতঃ অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে, পরে আরও সাধারণভাবে, প্রথমতঃ স্থূলভাবে, ক্রমশঃ অধিকতর সূক্ষ্মভাবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই। তখন জাতি সমষ্টিগতভাবে নিজের জীবন, সামাজিক ধ্যানধারণা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিকশিত চিন্তাশক্তির আলোকে পর্য্যালোচনা করে এবং শেষে বিশ্লেষণমূলক ও গঠনমূলক বুদ্ধির দ্বারা সকল বিষয়কে বিচার করিয়া দেখে ও নিয়ন্ত্রিত করে। এই অবস্থায় অনেক কিছু মহান্ হইবার সম্ভাবনা, আবার এই অবস্থার বিশিষ্ট বিপদ্‌গুলিও কম নহে। স্বচ্ছ বোধশক্তি এবং অবশেষে সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বৃদ্ধিতে যে সব সুবিধা

সকল সময়েই আসে, সমাজের এই অবস্থায় প্রথমতঃ সেই সুবিধাগুলি লাভ করা যায়; ইহার চরম পরিণতি হইতেছে নিয়মনিষ্ঠ, শৈথিল্যহীন ও সুরক্ষিত দক্ষতা (efficiency); সমালোচনামূলক ও গঠনমূলক বুদ্ধির, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পূর্ণ প্রয়োগের পুরস্কার ও ফলস্বরূপ এই দক্ষতা লাভ করা যায়। সমাজ-বিকাশের এই স্তরে আরও একটি মহত্তর পরিণাম হইতেছে মহান্ ও উজ্জ্বল ভাব ও আদর্শসমূহের আবির্ভাব। এই সব আদর্শ মানুষকে প্রাণের খেলার গণ্ডী হইতে, তাহার আদিম সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনীতিক প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা সমুদয় হইতে উপরে তুলিতে চাহে, গতানুগতিক আচার অনুষ্ঠানের উপরে তুলিতে চাহে, সমষ্টির জীবন লইয়া কল্পনার তেজোব্যঞ্জক নানা নির্ভীক পরীক্ষার প্রেরণা আনিয়া দেয় এবং এইভাবে আরও উচ্চতর সমাজ-জীবনের সম্ভাবনার ক্ষেত্র খুলিয়া দেয়। জীবনের উপর এইরূপ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োগ এবং ইহার উচ্চতম ফলস্বরূপ নিয়মনিষ্ঠ, সুসম্পন্ন, সুরক্ষিত দক্ষতা, এইরূপ সজ্ঞানে মহান্ সামাজিক ও অর্থনীতিক আদর্শ-সমূহের অনুসরণ, এবং এই চেষ্টার সাফল্যের পরিমাণ-স্বরূপ ক্ষেত্রবিশেষে সমাজের প্রগতি—এই সবই হইয়াছে য়ুরোপের সামাজিক ও রাজনীতিক প্রচেষ্টার বিশিষ্ট সুবিধা, তাহাতে অন্য যতই অসুবিধা বা অপূর্ণতা থাকুক।

অন্যপক্ষে, বুদ্ধি যখন এইভাবে জীবনের উপাদানের উপরে একমাত্র নিয়ন্তা হইবার দাবী করে, তখন সে দেখিতে চাহে না যে, সমাজ একটা জীবন্ত জিনিষ, জীবন্তভাবে ইহার বিকাশ হইতেছে। পরন্তু দেখে, উহা যেন একটা জড় যন্ত্র,—তাহাকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারা যায়, ইট, কাঠ বা লোহার ন্যায় প্রাণহীন জড়পদার্থের মত বুদ্ধির খেয়াল অনুসারে গড়িয়া তোলা যায়। বুদ্ধি বেশী কূটতর্ক ও কল্পনাজাল রচনা করিতে গিয়া, যন্ত্রবৎ দক্ষতা খুঁজিতে গিয়া, জাতির জীবনের সহজ সূত্রগুলি হারাইয়া ফেলে; জাতির জীবনীশক্তির যে নিগূঢ় উৎস, তাহার সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলে। ইহার ফল হয় এই যে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও পদ্ধতির উপরে, আইনকানুন ও শাসনপ্রণালীর উপরেই অত্যধিকভাবে নির্ভর করা হয় এবং জীবন্ত জাতির পরিবর্ত্তে এক যন্ত্রবৎ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার দিকেই মারাত্মক ঝোঁক আসে। যাহা সমাজ-জীবনের একটি সহায় বা যন্ত্রমাত্র, তাহাই ঐ জীবনের স্থান গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে এবং এইভাবে একটি শক্তিশালী কিন্তু যন্ত্রবৎ ও কৃত্রিম সংগঠন (organisation) সৃষ্ট হয়; কিন্তু বাহিরের দিকে এই যে লাভ হয়, তাহার মূল্যস্বরূপ মুক্ত ও সজীব জাতির শরীরে নিগূঢ়ভাবে আত্মবিকাশশীল

সমষ্টি-আত্মার যে জীবন তাহা বিনষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির এই যে ভুল, যান্ত্রিক পদ্ধতির গুরু চাপে প্রাণের ও আত্মার সহজোপলব্ধির ক্রিয়াকে নিগ্রহ করা, এইটিই য়ূরোপের দুর্ব্বলতা, ইহাই য়ুরোপের আশাকে প্রতারিত করিয়াছে এবং য়ুরোপকে তাহার নিজেরই উচ্চতর আদর্শসমূহের প্রকৃত সিদ্ধিতে উপনীত হইতে দেয় নাই।

যেমন ব্যষ্টিগত মানবজীবনে, তেমনই সমষ্টিগত সামাজিক জীবনে তৃতীয়স্তরে উপনীত হইয়াই, মানুষের চিন্তা যে সব আদর্শকে প্রথমে ধরিয়াছে ও পোষণ করিয়াছে তাহাদের প্রকৃত মূল কোথায় এবং সত্য-স্বরূপ কি তাহা জানিতে পারা যায় এবং সেগুলিকে বস্তুতঃ কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে তাহারও উপায় ও সর্ত্তসকল জানিতে পারা যায়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সিদ্ধ সমাজ কেবল সুদূর কল্পনা বা স্বপ্নমাত্র থাকে না। যত দিন না সেই তৃতীয় স্তরে পৌঁছান যাইতেছে, তত দিন আদর্শ সমাজ ভাস্বর মেঘের ন্যায় কেবল দূর হইতে দূরেই সরিয়া যাইবে, মানুষ তাহার দিকে ধাবিত হইয়া সর্ব্বদা বৃত্তাকারে ঘুরিবে; সর্ব্বদা তাহা মানুষের আশাকে বঞ্চিত করিবে, মানুষ ধরি ধরি করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিবে না। সেই তৃতীয় অবস্থা আসিবে তখনই, যখন মানুষ সমষ্টিগত সত্তায় আরও গভীরভাবে জীবনযাপন করিতে আরম্ভ

করিবে এবং সমষ্টিগত জীবনকে মূলতঃ প্রাণের প্রয়োজন, প্রেরণা, সহজোপলব্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবে না, আবার তর্কবুদ্ধির রচনা অনুসারেও নিয়ন্ত্রিত করিবে না, পরন্তু তাহার মহত্তর সত্তা ও আত্মার সন্ধান পাইবে এবং প্রথমতঃ, প্রধানতঃ ও সর্ব্বদা সেই আত্মার ঐক্য, সহানুভূতি, স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বাধীনতা এবং সাবলীল ও সজীব নিয়ম অনুসারে সমষ্টির জীবনকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিবে; ঐ আত্মার মধ্যেই ব্যষ্টিগত ও সমাষ্টগত জীবনের স্বাধীনতা, পূর্ণতা ও ঐক্যের সূত্র নিহিত আছে। কিন্তু এইরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিবারও মত উপযোগী অবস্থা এ পর্য্যন্ত কোথাও মিলে নাই। কারণ, এই অবস্থা তখনই আসিতে পারে, যখন অধ্যাত্মজীবনে পৌঁছান ও প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা কেবল কতকগুলি অসাধারণ ব্যক্তিরই সাধনা থাকিবে না, কিম্বা সাধারণের মধ্যে লৌকিক গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণেই পর্য্যবসিত হইবে না, কিন্তু এইটিই যে মানব-জীবনের অবশ্যপালনীয় প্রয়োজন এবং এইটিকে ঠিকভাবে, যথার্থভাবে লাভ করিয়াই মানবজাতি ক্রমবিকাশের পর্য্যায়ে আর এক পদ অগ্রসর হইতে পারে, লোক তাহা উপলব্ধি করিবে এবং সেই অনুসারে জীবনকে চালিত করিবে।

তেজীয়ান্ স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণশক্তির যে প্রথম স্তর

তাহার ভিতর দিয়াই অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেরও প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমষ্টি (Communities) গড়িয়া উঠিয়াছিল, প্রাণশক্তি সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে নিজের বিকাশের পথ ও আদর্শ ঠিক করিয়া লইয়াছিল, সমষ্টিগত প্রাণের সহজোপলব্ধি ও প্রকৃতি হইতেই জীবনের কাঠামো, সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক অনুষ্ঠান বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ জনসমষ্টিগুলি পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া শিক্ষা-দীক্ষাগত ও সামাজিক ঐক্যে যেমন বাড়িয়া উঠিল এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিল, তেমনই তাহাদের মধ্যে বিকশিত হইল এক সাধারণ আত্মা এবং এক সাধারণ ভিত্তি ও সাধারণ গঠন। তাহার মধ্যে ছোট ছোট ব্যাপারে স্বাধীন বৈচিত্র্যের যথেষ্ট স্থান ছিল। কঠোর একরূপতার (a rigid unifomity) কোনও প্রয়োজন ছিল না ; সাধারণ আত্মা ও সাধারণ প্রাণের গতি ঐ বৈচিত্র্য-বিকাশের স্বাধীনতার উপরে এক সাধারণ ঐক্যের সূত্র স্থাপন করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এমন কি, যখন বিশাল রাজ্য ও সাম্রাজ্যসকল গড়িয়া উঠিতেছিল, তখনও ঐ সব স্বভাবসিদ্ধ ছোট ছোট রাজ্য, গণতন্ত্র, জাতিগুলিকে যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছিল, নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে সেগুলিকে একবারে ধ্বংস বা বর্জ্জন করা হয় নাই। জাতির

স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে যাহা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই বা যাহার আর কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই, তাহা আপনা হইতেই খসিয়া পড়িয়াছিল এবং অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছিল; যাহা নূতন অবস্থা ও পরিবেষ্টনের অনুযায়ী আপনাকে স্বতঃই পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া টিকিতে পারিয়াছিল, তাহাকে টিকিতে দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবাসীর বিশিষ্ট প্রকৃতি ও জীবন-বিকাশের ধারার সহিত যাহার নিগূঢ় সামঞ্জস্য ছিল, সে সবই ভারতের স্থায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

পরে যখন চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধির উৎকর্ষসাধনের যুগ আসে, তখনও এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনের নীতি সম্মানিত হইয়াছিল। সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে, ভারতের মনীষিগণ অব্যবহারিক তর্কবুদ্ধির (abstract intelligence) সহায়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন আদর্শ রচনা করাকে নিজেদের কাজ বলিয়া মনে করিতেন না, সমষ্টিগত মন ও প্রাণের দ্বারা সমাজ-জীবনের যে সব অনুষ্ঠান ও ধারা পূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছে, সেই সবকেই তাঁহারা ব্যবহারিক বুদ্ধির (Practical reason) সহায়ে বুঝিতে ও সুপরিচালিত করিতে চাহিতেন, আদিম অবয়বগুলিকে ধ্বংস না করিয়া, তাহাদের

বিকাশ, দৃঢ়তা ও সামঞ্জস্যসাধন করিতে চাহিতেন, যাহা কিছু নূতন অবয়ব, নূতন ভাব গ্রহণ করা প্রয়োজন হইত, তাহা অবয়ব-বৃদ্ধি বা আবশ্যক পরিবর্ত্তন হিসাবেই গ্রহণ করা হইত, প্রাচীনের ধ্বংস বা বিপ্লবসাধন করিয়া নহে। এই ভাবেই পূর্ব্ব-প্রচলিত রাষ্ট্রতন্ত্রগুলিকে পূর্ণ বিকসিত রাজতন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছিল ; রাজা বা সম্রাটের একাধিপত্যে বিদ্যমান অনুষ্ঠানগুলিকে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াই এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। উপরে রাজতন্ত্র বা সাম্রাজ্যতন্ত্র চাপিয়া বসায় তাহাদের অনেকেরই পদমর্য্যাদা ও স্বরূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব সেগুলি লুপ্ত হইয়া যায় নাই। ইহার ফলে আমরা ভারতে য়ুরোপের ন্যায় বুদ্ধি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত আদর্শের অনুসরণে রাজনীতিক প্রগতি (Progress) অথবা বিপ্লবমূলক পরীক্ষা দেখিতে পাই না ; এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা আদর্শ বা থিওরি রচনা করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রে বিপ্লবের ভিতর দিয়া প্রগতি ও পরীক্ষা প্রাচীন ও আধুনিক য়ুরোপের বিশিষ্ট লক্ষণ। অপর পক্ষে, প্রাচীন সৃষ্টিগুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভারতীয় মনোভাবে সমধিক শক্তিশালী ; কারণ, ঐ সৃষ্টিগুলি ভারতীয় মন ও প্রাণের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, ভারতের স্বধর্ম্মের সুষ্ঠু প্রকাশ ; এই যে রক্ষণশীল প্রবৃত্তি, পরবর্ত্তী মহান্ বুদ্ধিবিকাশের যুগেও ইহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং আরও

দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলাকে নষ্ট না করিয়া, সমাজে ও রাষ্ট্রে অতীত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, ধীরে ধীরে আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ—ইহাই ছিল প্রগতির একমাত্র পথ, অন্য কোন পন্থা সম্ভব ছিল না, স্বীকৃতও হইত না। পক্ষান্তরে, জাতির জীবনের স্বাভাবিক বিন্যাসের পরিবর্ত্তে যান্ত্রিক বিন্যাস যে য়ুরোপীয় সভ্যতার ব্যাধিস্বরূপ হইয়াছে, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি কখনও সেই দুরবস্থায় পৌঁছায় নাই ; য়ুরোপের যান্ত্রিক বিন্যাসের (mechanical order) এখন পরিণতি হইতেছে, বিকট কৃত্রিম আমলাতন্ত্র ও শিল্পতন্ত্র ষ্টেট (the Bureaucratic and Industrial State)। আদর্শরচনাকারী বুদ্ধির যে সব সুবিধা, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে সে সব ছিল না, কিন্তু তেমনই বুদ্ধি যান্ত্রিকতার সৃষ্টি করায় যে সব অসুবিধা হয়, সে সব অসুবিধাও ছিল না।

সহজোপলব্ধির (Intuition) অনুসরণ করাই ভারতীয় মনের চিরন্তন সুগভীর অভ্যাস, এমন কি, যখন ভারতবাসী যৌক্তিক বুদ্ধির (reasoning intelligence) অনুশীলন করিতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত তখনও সেই অভ্যাস অক্ষুণ্ণ ছিল। অতএব ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা সকল সময়েই চেষ্টা করিয়াছে আত্মার সহজোপলব্ধিগুলির সহিত

প্রাণের সহজোপলব্ধিগুলিকে মিলাইয়া লইতে, বুদ্ধির আলোককে আনিয়াছে কেবল ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে। জীবনের নিশ্চিত ও স্থায়ী বাস্তব তথ্যের উপরেই তাহা নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে, আদর্শবাদের জন্য বুদ্ধির উপরে নির্ভর না করিয়া আত্মার আলোক, প্রেরণা ও উচ্চতর অনুভূতি উপলব্ধির উপরে নির্ভর করিয়াছে, কোনও পদক্ষেপ ঠিক হইতেছে কি না, বুদ্ধির বিচারের দ্বারা পরীক্ষা ও নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে, বুদ্ধি প্রাণ ও আত্মার স্থান গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে কেবল সাহায্য করিয়াছে;—সকল সময়ে প্রাণ ও আত্মাই সত্য ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করিতে পারে। ভারতের অধ্যাত্মভাবাপন্ন মন জীবনকে আত্মার অভিব্যক্তি বলিয়াই ধারণা করিয়াছে; সমাজ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার দেহ, জনগণ সমষ্টিগত ব্রহ্মার প্রাণ-শরীর, সমষ্টি-নারায়ণ, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগত ব্রহ্মা, স্বতন্ত্র জীব, ব্যষ্টি-নারায়ণ; রাজা ভগবানের জীবন্ত প্রতিনিধি এবং সমাজের অন্যান্য অংশ ও শ্রেণী সমষ্টিগত আত্মার বিভিন্ন স্বাভাবিক শক্তি, প্রকৃতয়ঃ। অতএব, স্বীকৃত রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার, সকল অংশসমেত সমাজ ও রাষ্ট্র-শরীরের গঠন, এ সবের আধিপত্য স্বীকার করিতে সকলেই যে বাধ্য

ছিল শুধু তাহাই নহে, এ সব কতকটা পবিত্র ও পূজার্হ বলিয়াই পরিগণিত হইত।

প্রাচীন ভারতীয়গণ বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি যথাযথভাবে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, নিজের প্রকৃতির এবং নিজের শ্রেণীর বা জাতির প্রকৃতির সত্যধারা ও আদর্শ অনুসরণ করে এবং সেইরূপ প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক সঙ্ঘবদ্ধ সমষ্টি-জীবনও যদি স্বধর্ম্মের, স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করে, তাহা হইলেই বিশ্বজগতের যেমন সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, মানব-জীবনেও সেইরূপ শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়। পরিবার, কুল, জাতি (caste), শ্রেণী, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, শ্রমিক ও অন্যবিধ সঙ্ঘ, নেশন (nation), জনসমূহ (people), এই সবই হইতেছে জীবন্ত সমষ্টিসত্তা, ইহারা নিজ নিজ ধর্ম্মের বিকাশ করে এবং সেই ধর্ম্মের অনুসরণ করিলেই তাহারা রক্ষা পায়, সুস্থভাবে টিকিয়া থাকিতে এবং সুচারুভাবে কর্ম্ম করিতে পারে। আবার পদমর্য্যাদাজনিত ও অন্যের সহিত সম্বন্ধজনিত কর্ত্তব্যধর্ম্ম আছে, দেশকালের অবস্থা অনুযায়ী যুগধর্ম্ম আছে, সার্ব্বজনীন রিলিজন্ * ও নৈতিক ধর্ম্ম আছে—

---

* ইংরাজীতে রিলিজন্ (religion) বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতে "ধর্ম্ম" তাহা অপেক্ষা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।—রিলিজন্ ধর্ম্মের একটা দিক বা অঙ্গমাত্র। সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সকল প্রকার নীতি ও আদর্শের সাধারণ নাম ধর্ম্ম।

এই সকল প্রকারের ধর্ম্ম স্বধর্ম্মের (স্বভাব অনুসারে কর্ম্মই স্বধর্ম্ম) উপরে ক্রিয়া করিয়া শাস্ত্রবিধান সমূহ সৃষ্টি করে। প্রাচীন ধারণা এই ছিল যে, ব্যক্তিগত-ভাবে ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের অবস্থা যখন সম্পূর্ণ অবিকৃত ও নির্দ্দোষ (ইহাই কাল্পনিক সত্য-যুগ বা স্বর্ণ-যুগ), তখন আর কোন রাজনীতিক শাসনতন্ত্রের, ষ্টেটের বা সমাজের কৃত্রিম অনুষ্ঠান প্রয়োজন হয় না। কারণ, তখন সকলে আপন আপন প্রবুদ্ধ আত্মা ও ভাগবত-অধিষ্ঠিত সত্তার সত্য অনুসারে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করে এবং সেই জন্য আপনা হইতেই আভ্যন্তরীণ দিব্যধর্ম্মের অনুসরণ করে। অতএব আত্মনিয়ন্ত্রণশীল ব্যক্তি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণশীল সমাজ আপন আপন সত্তার যথার্থ ও স্বচ্ছন্দ ধর্ম্ম অনুসারে জীবন যাপন করিবে, ইহাই আদর্শ। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মানুষের যে অবস্থা, তাহাতে তাহার প্রকৃতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধর্ম্মের বিকৃতি ও বিচ্যুতির অধীন, অজ্ঞান ও ব্যভিচারী। এরূপ অবস্থায় সমাজের স্বাভাবিক জীবনের উপর ষ্টেট, রাজশক্তি, বা শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া প্রয়োজন ; এই রাজশক্তি অযথাভাবে সমাজের জীবনে হস্তক্ষেপ করিবে না, সমাজ-জীবনকে প্রধানতঃ স্বাভাবিক নিয়ম ও রীতিনীতি অনুসারে স্বচ্ছন্দভাবে বিকশিত হইতে দিতে হইবে ; রাজশক্তি শুধু দেখিবে, সমাজ

ঠিক পথে চলিতেছে কি না, ধর্ম্ম সতেজ আছে কি না, পালিত হইতেছে কি না। ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণকে শাস্তি দিবে, দমন করিবে, যথাসম্ভব অধর্ম্মাচরণ নিবারণ করিবে এবং এইভাবে সমাজকে আপনার পথেই ঠিকমত চলিতে সাহায্য করিবে। ধর্ম্ম যখন আরও অধিক বিকৃত অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন সমগ্র সমাজ-জীবনকে বাহ্য বা লিখিত বিধিনিষেধের শাস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন হয়, শাস্ত্রকর্ত্তা, আইনকর্ত্তার প্রয়োজন হয়; কিন্তু আইন বা শাস্ত্র প্রণয়ন করা রাজা বা রাজশক্তির কার্য্য ছিল না, রাজশক্তি ছিল কেবল প্রয়োগকর্ত্তা (administrator); সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধিবিধান নির্দ্ধারণ করিতেন ঋষি এবং সে সবের রক্ষা ও ব্যাখ্যা করিতেন ব্রাহ্মণ। আবার ঐ বিধিবিধান (লিখিতই হউক বা অলিখিতই হউক) রাজশক্তি বা ব্যবস্থাপক কর্ত্তৃক সৃষ্ট বা উদ্ভাবিত হইবার জিনিষ ছিল না, উহা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহার স্বরূপ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইত অথবা সমাজের জীবন ও চেতনায় প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি হইতেই উহা কেমন স্বাভাবিকভাবে উঠিয়াছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইত। এইভাবে কৃত্রিমতা ও গতানুগতিকতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অবশেষে এমন অধম অবস্থা আসিবেই, যখন সমাজ দ্বন্দ্ব, অনাচার ও

বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে, ধর্ম্ম লয়প্রাপ্ত হইবে (ইহাই কলিযুগ)। এইরূপ চরম গ্লানির অবস্থা উপস্থিত হইলে তখন বিপ্লবের রক্তরেখার ভিতর দিয়া মানবাত্মা আবার নিজেকে ফিরিয়া পায়, আবার অভিনবভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়।

অতএব রাজশক্তির, রাজা ও রাজ-পরিষদ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য শাসক বিভাগের, প্রধান কাজ ছিল সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করা; রাজশক্তি ছিল ধর্ম্মের পালক ও প্রয়োগকর্ত্তা। সমাজেরই কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল মানুষের জীবনধারণ ও বিকাশের প্রয়োজনগুলি সিদ্ধ করা, ভোগসুখে মানুষের যে স্বাভাবিক দাবী আছে, সেই দাবী যথাযথভাবে পূর্ণ করা। তবে এই সকল প্রয়োজন ও ভোগের নিয়মিত মাত্রা ছিল এবং সে সব নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী ছিল। সমাজ-রাষ্ট্র শরীরের (Socio-political body) সকল অবয়ব ও সকল সঙ্ঘের আপন আপন ধর্ম্ম ছিল, সে ধর্ম্ম তাহাদের স্বভাব, তাহাদের স্থান, এবং সমগ্র সমাজ-শরীরের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের দ্বারা নির্ণীত হইত। প্রত্যেকে যাহাতে স্বাধীন ও যথাযথভাবে আপন আপন ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে পারে, সে সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিতে হইত, নিজেদের

সীমার মধ্যে আপন আপন স্বভাব অনুসারে কর্ম্ম করিতে সকলকে স্বাধীনতা দিতে হইত; কিন্তু আবার সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইত, যেন তাহারা নিজেদের, গণ্ডী অতিক্রম না করে, অপরের সীমানায় অনধিকারপ্রবেশ না করে, নিজেদের সত্য পন্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া না পড়ে, যথোচিত মাত্রা ছাড়িয়া না যায়। ইহাই ছিল সর্ব্বোচ্চ রাজশক্তির কার্য্য, সভার সাহায্যে সপরিষদ রাজার কার্য্য। জাতি, ধর্ম্মসম্প্রদায়, শ্রমিকসঙ্ঘ, গ্রাম, নগর প্রভৃতির স্বাধীন ক্রিয়ার উপর হস্তক্ষেপ করা বা দেশের জীবনের সহিত নিগূঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট আচার-ব্যবহারের ব্যতিক্রম করা বা তাহাদের স্বাধিকারসকল লুপ্ত করা রাজশক্তির কার্য্য ছিল না। কারণ, যথাযথভাবে সমাজধর্ম্মপালন করিবার নিমিত্ত এইগুলি অপরিহার্য্য বলিয়া এ সবের উপরে সকলের জন্মগত অধিকার স্বীকৃত হইত। রাজশক্তিকে যাহা করিতে হইত তাহা কেবল এই—সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইত, সকলের উপরে সাধারণ-ভাবে শাসন রাখিতে হইত, বাহিরের আক্রমণ বা ভিতরের বিপ্লব হইতে সমাজ-জীবনকে রক্ষা করিতে হইত, দুষ্কর্ম্ম ও অশান্তি দমন করিতে হইত, সমাজের অর্থনীতিক ও শিল্পবিষয়ক কল্যাণের পথ পরিষ্কার করিতে সাধারণভাবে সাহায্য ও দেখাশুনা করিতে

হইত, সকল বিষয়ে সুবিধা আছে কি না দেখিতে হইত এবং এই সকল করিবার জন্য অপরের যে শক্তি নাই, রাজাকে সেই সকল শক্তি ব্যবহার করিতে হইত।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা-বিধায়ক এক জটিল অনুষ্ঠান। সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের ছিল নিজস্ব স্বাভাবিক জীবন, প্রত্যেকে নিজের জীবন ও কর্ম্ম নিজে পরিচালনা করিত, আপন আপন ক্ষেত্রের স্বাভাবিক গণ্ডীর দ্বারা প্রত্যেকে অপর হইতে পৃথক্ ছিল, কিন্তু সমগ্রের সহিত সকলে সুপরিজ্ঞাত সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। সাধারণ সমাজ-জীবনের কর্ত্তব্য ও অধিকারসমূহে প্রত্যেকে ছিল আর সকলের সঙ্গে অংশীদার। প্রত্যেকে নিজের নিয়মকানুন প্রয়োগ করিত, নিজের ক্ষেত্রে নিজের কার্য্য নিজে পরিচালিত করিত, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের ব্যাপার অপরের সহিত মিলিত হইয়া আলোচনা করিত, পরিচালনা করিত এবং রাজা বা সম্রাটের সাধারণ সভায় সকলেরই আপন আপন যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রতিনিধি থাকিত। ষ্টেট, রাজা বা সর্ব্বোচ্চ রাজশক্তি ছিল সামঞ্জস্য-সাধনের, সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতা-সাধনের যন্ত্র। তাহার প্রভুত্ব ছিল সকলের উপরে, কিন্তু তাহাই

একমাত্র সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা ছিল না; কারণ তাহার সকল অধিকার ও ক্ষমতায় সে ছিল ধর্ম্ম বা আইনের দ্বারা বাধ্য এবং জনগণের ইচ্ছার অধীন; এবং ভিতরের সমস্ত ব্যাপার পরিচালনায় সে ছিল সমাজ-রাষ্ট্র-শরীরের অন্যান্য অংশের সহিত একটি অংশীদার মাত্র।

ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ইহাই ছিল থিওরি এবং বাস্তবিক গঠনভঙ্গি,—সাম্প্রদায়িক (Communal) স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের জটিল অনুষ্ঠান, সকলের উপরে সামঞ্জস্য-সাধনের এক কর্ত্তা, রাজপুরুষ ও রাজশক্তি, তাহার যথেষ্ট কার্য্যকরী ক্ষমতা, পদমর্য্যাদা, কিন্তু সে সব যথাযোগ্য ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা একই সঙ্গে অপরকে শাসন করিতেছে, আবার অপরের দ্বারা শাসিত হইতেছে, সকল বিভাগেই তাহাদিগকে সক্রিয় অংশীদাররূপে স্বীকার করিতেছে, সমাজ-জীবনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা কার্য্য তাহাদিগকেও ভাগ দিতেছে; এবং রাজা, জনসাধারণ এবং ইহার অন্তর্গত সমুদয় সম্প্রদায় ও সঙ্ঘ সকলেই সমানভাবে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে বাধ্য, ধর্ম্মের শৃঙ্খলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এতদ্ব্যতীত সমাজ-জীবনের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির দিক ছিল ধর্ম্মের কেবল একটা অংশমাত্র, এবং সে অংশ ছিল অন্যান্য অংশের সহিত, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সমাজের উচ্চতর শিক্ষা-দীক্ষার পরিচায়ক আদর্শের

সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। রাজনীতি ও অর্থনীতি নৈতিক আদর্শের (ethical law) দ্বারা প্রভাবিত ছিল ; রাজা এবং তাঁহার মন্ত্রিগণ, মন্ত্রণাপরিষদ ও সাধারণ রাজসভা, প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক স্বতন্ত্র সঙ্ঘ, সকলকেই প্রত্যেক কর্ম্মে নীতির বিধান মানিয়া চলিতে হইত। প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে কাহাকে ভোট দেওয়া হইবে, কোন্ ব্যক্তি মন্ত্রী বা রাজকর্ম্মচারী হইবার যোগ্য, এই সব নির্দ্ধারণ করিতে নৈতিক চরিত্র ও উচ্চ-শিক্ষা-দীক্ষার হিসাব লওয়া হইত ; আর্য্যজাতির কার্য্যপরিচালনায় যাহারা প্রভুত্ব করিবে, তাহাদিগকে চরিত্রে ও শিক্ষা-দীক্ষায় খুব উচ্চ হইতে হইত। রাজা ও জনসাধারণের সমগ্র জীবনের পশ্চাতে ও শীর্ষে ছিল ধর্ম্মভাব (religious spirit) ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ। যদিও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ ও অংশের বিশিষ্ট বিকাশের উপর প্রয়োজনীয় ঝোঁক দেওয়া হইত, তথাপি সমাজ-জীবনটাই চরম লক্ষ্য বলিয়া ততটা গরিগণিত হইত না ; পরন্তু সকল অংশসমেত সমগ্র সমাজ-প্রতিষ্ঠানটিকেই দেখা হইত যেন মানুষের মন ও আত্মার শিক্ষা ও বিকাশের মহান্ ক্ষেত্র—এই ক্ষেত্রে প্রাকৃত জীবনের বিকাশ করিয়া মানুষ ক্রমশঃ অধ্যাত্ম জীবনলাভ করিবে।

ভারতীয় রাষ্ট্রবিকাশের ধারা

প্রাপ্য প্রমাণপত্রাদি হইতে যত দূর জানিতে পারা যায়, ভারতীয় সভ্যতার সমাজ-রাষ্ট্রীয় বিকাশ চারিটী ঐতিহাসিক অবস্থার ভিতর দিয়া হইয়া আসিয়াছে। প্রথমে ছিল সরল আর্য্য সমাজ, তাহার পর একটি দীর্ঘ পরিবর্ত্তনের যুগে রাষ্ট্রগঠন ও সমন্বয়ের পরীক্ষামূলক বহু বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবন অগ্রসর হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, রাজতন্ত্র সুনিশ্চিতভাবে গঠিত হইয়া সমষ্টিগত (communal) জীবনের বহুমুখী অংশকে পরস্পরের সহিত সুসম্বন্ধ ও সঙ্গত করিয়া দেশগত ও সাম্রাজ্যগত ঐক্যের বিধান করিয়াছে। অবশেষে আসিয়াছে অধঃপতনের অবস্থা, ভিতর হইতে উন্নতির গতি স্তব্ধ হইয়াছে, জাতীয় জীবনপ্রবাহ অচল হইয়া উঠিয়াছে, এবং পশ্চিম-এসিয়া ও য়ুরোপ হইতে নূতন কাল্‌চার, নূতন তন্ত্র আসিয়া দেশের উপরে চাপিয়া পড়িয়াছে। প্রথম তিনটি যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে, জাতীয় অনুষ্ঠানগুলির আশ্চর্য্যজনক দৃঢ়তা ও স্থায়ী মজবুত গঠন; মূলগত এই স্থিতিশীলতার ফলে জাতীয় জীবনের যথাযথ, প্রাণময় ও শক্তিমান বিকাশ ধীরে-সুস্থে সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু আবার সেই জন্যই

উহা নিশ্চিতভাবে গড়িয়া উঠিতে এবং সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রাণময় ও পরিপূর্ণ হইতে পারিয়াছিল। এমন কি, অধঃপতনের যুগেও এই দৃঢ়প্রতিষ্ঠতা ধ্বংসের গতিকে বিশেষভাবে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। সংস্থানটি বিদেশী চাপে উপরে ভাঙ্গিয়া পড়ে, কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার ভিত্তিটিকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, এবং যেখানেই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেইখানেই নিজের বিশিষ্ট ব্যবস্থার অনেকখানি বজায় রাখিয়াছিল, এমন কি, শেষের দিকেও নিজস্ব আদর্শ ও অনুষ্ঠানগুলির পুনরুদ্ধারসাধনের প্রয়াস করিতে পুনঃ পুনঃ সমর্থ হইয়াছিল। আর এখন যদিও সে রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবেই লোপ পাইয়াছে এবং তাহার অবশিষ্ট অংশগুলিকে জোর করিয়াই ধ্বংস করা হইয়াছে, তথাপি যে বিশিষ্ট সামাজিক মনীষা ও প্রকৃতি উহার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা লুপ্ত হয় নাই, সমাজের বর্ত্তমান স্রোতোহীন, দুর্ব্বল, বিকৃত ও ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার মধ্যেও তাহা টিকিয়া আছে, এবং যদিও উপস্থিত বিপরীত রকমের প্রবৃত্তিসকল দেখা যাইতেছে, একবার নিজের ইচ্ছামত নিজের ভাবে কার্য্য করিবার স্বাধীনতা পাইলেই তাহা পাশ্চাত্য বিকাশের গতি অনুসরণ না করিয়া নিজের সত্তা হইতেই নূতন সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইতে পারে। জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তা এখন অস্পষ্টভাবে যে

ইঙ্গিত দিতেছে, তখন হয় ত তাহারই অনুগামী হইয়া কমিউন্যাল বা সমষ্টিগত জীবনের তৃতীয় স্তর ও মানব-সমাজের অধ্যাত্মভিত্তি আরম্ভ করিবার দিকেই অগ্রসর হইতে পারে। যাহাই হউক, অনুষ্ঠানগুলির সুদীর্ঘ স্থায়িত্ব, এবং তাহারা যে জীবনের আধার ছিল তাহার মহত্ত্ব, নিশ্চয়ই অক্ষমতার পরিচায়ক নহে, বরং তাহা ভারতীয় মণীষার অসাধারণ রাজনীতিক সহজদৃষ্টি ও শক্তিরই পরিচয় দেয়।

একটি নীতি বরাবর ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের সমুদয় গঠন, বিস্তার ও পুনর্গঠনের মূলে স্থায়িভাবে বিদ্যমান ছিল। সেটি হইতেছে, ভিতর হইতে স্ব-নিয়ন্ত্রিত কমিউন্যাল বা সমষ্টিগত সঙ্ঘবদ্ধ জীবনপ্রণালী ;—কেবল মোটের উপর স্ব-নিয়ন্ত্রণ নহে, ভোটের দ্বারা একটা বাহ্য প্রতিনিধিমূলক সভা গঠন করিয়া স্ব-নিয়ন্ত্রণ নহে ; এরূপ সভা জাতির কেবল একটা অংশের, রাজনীতিক চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরই, প্রতিনিধি হইতে পারে, এবং আধুনিক প্রণালী ইহা অপেক্ষা আর বেশী কিছু করিতে পারে নাই ; কিন্তু তাহা ছিল জাতির জীবনের প্রত্যেক স্পন্দনে এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র অঙ্গে স্ব-নিয়ন্ত্রণ (Self-determination)। স্বাধীন সমন্বয়শীল কমিউন্যাল বিধান, ইহাই ছিল তাহার স্বরূপ, এবং তাহার লক্ষ্য ছিল ততটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নহে, যতটা সমষ্টিগত,

সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা। প্রথম প্রথম সমস্যাটি খুবই সরল ছিল। কারণ, তখন কেবল দুই প্রকার কমিউন্যাল মূল অনুষ্ঠানের হিসাব লইতে হইত,—গ্রাম এবং কুল। প্রথমটির স্বাধীন স্বাভাবিক জীবন স্ব-নিয়ন্ত্রণশীল পল্লীসমাজের ভিত্তির উপরে স্থাপন করা হইয়াছিল, এবং তাহা এমনই পূর্ণতার সহিত ও মজবুতভাবে করা হইয়াছিল যে, সেটি কালের সমস্ত অত্যাচার এবং অন্যান্য তন্ত্রের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়া প্রায় আমাদের সমকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কেবল সে দিন তাহা ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের নির্ম্মম ও প্রাণহীন যান্ত্রিক-তার নিদারুণ চাপে পিষ্ট হইয়া লোপ পাইয়াছে। গ্রামের লোক ছিল প্রধানতঃ কৃষিজীবী, এবং সকলে মোটের উপর একটি সঙ্ঘে মিলিত হইয়া ছিল; সেই একই সঙ্ঘ ছিল ধার্ম্মিক, সামাজিক, সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিক সঙ্ঘ; নিজেদের সমিতির ভিতর দিয়া তাহারা নিজেদের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের উপর নেতাস্বরূপ ছিলেন রাজা, এবং তখনও সামাজিক কর্ম্মের স্পষ্ট কোন ভাগাভাগি হয় নাই এবং কর্ম্ম অনুসারে শ্রেণীবিভাগও হয় নাই।

কিন্তু এই যে প্রণালী, ইহা কেবল সরলতম কৃষিজীবন, এবং অত্যল্পপরিসর স্থানের মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্র জনসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুরই পক্ষে উপযোগী নহে, এই কারণেই অধিকতর জটিল কম্যুন্যাল অনুষ্ঠানের বিকাশ

করা এবং ভারতীয় মূল নীতিটির প্রয়োগ কিছু পরিবর্ত্তিত ও অপেক্ষাকৃত জটিল করার সমস্যা বাধ্য হইয়াই উঠিয়াছিল। আর্য্যজাতির সকল শাখারই প্রথমতঃ যে কৃষি ও পশুপালনের জীবন ছিল, তাহাই বরাবর প্রশস্ত ভিত্তিস্বরূপ রহিল, কিন্তু এই ভিত্তির উপরে ক্রমশঃ বেশী বেশী সমৃদ্ধ বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য অসংখ্য বৃত্তির একটা ঊর্দ্ধস্তর গড়িয়া উঠিল। সামরিক, রাষ্ট্রনীতিক, ধার্ম্মিক ও শিক্ষাদীক্ষাবিষয়ক বৃত্তিগুলি লইয়া একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঊর্দ্ধস্তর গড়িয়া উঠিল। বরাবর পল্লী-সমাজই রহিল স্থায়ী মূল অনুষ্ঠান, সমাজ-শরীরের জমাট ও অবিধ্বংসী পরমাণু, কিন্তু দশ দশটি ও শত শতটি গ্রাম লইয়া এক রকমের সমষ্টিজীবন গড়িয়া উঠিল। এইরূপ প্রত্যেক সমষ্টির রহিল এক জন করিয়া মাথা, এবং প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন হইল নিজস্ব শাসনতন্ত্র; আবার যেমন যুদ্ধজয় বা অন্যের সহিত মিশ্রণের দ্বারা কুল ও বংশগুলি বৃহদাকার জাতিতে পরিণত হইতে লাগিল, তেমনই ঐ সমষ্টিগুলিকে লইয়া এক একটা রাজতন্ত্র বা সম্মিলিত গণতন্ত্র গড়িয়া উঠিল, আবার এই রাজ্য বা গণতন্ত্র-গুলিকে মণ্ডলস্বরূপে গ্রহণ করিয়া বৃহত্তর রাজ্য গঠিত হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই এক বা একাধিক মহাসাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। এই যে ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশ এবং অবস্থান্তরের আবির্ভাব, ইহার সহিত সামঞ্জস্য

রাখিয়া ভারতের কম্যুন্যাল স্ব-নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার মূল-নীতিটি কতদূর কৃতকার্য্যতার সহিত প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহাতেই ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভার প্রকৃত পরীক্ষা।

এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই ভারতের মনীষা সুদৃঢ় চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিকাশ করিয়াছিল; ঐ ব্যবস্থা ছিল একই সঙ্গে ধার্ম্মিক ও সামাজিক। বাহ্যতঃ দেখিলে মনে হইতে পারে বটে যে, এক সময়ে না এক সময়ে অধিকাংশ মানবসমাজই যে সুপরিচিত সমাজবিভাগের বিকাশ করিয়াছিল—পুরোহিত-সম্প্রদায়, যোদ্ধা ও রাষ্ট্রনীতিক অভিজাত-সম্প্রদায়, শিল্পী, স্বাধীন কৃষক ও বৈশ্য-সম্প্রদায় এবং দাস ও শ্রমিক-সম্প্রদায়—ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্য সেই রকমই একটা অপেক্ষাকৃত কড়াকড়ি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই সাদৃশ্যটি শুধু বাহিরের, ভারতের যে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা, তাহার মূলগত সত্যটি ছিল বিভিন্ন। বৈদিক যুগের শেষভাগে এবং পরবর্ত্তী রামায়ণ-মহাভারতের যুগে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগটি ছিল একই সঙ্গে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে সমাজের ধার্ম্মিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক কাঠামো। সেই কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেক বর্ণের একটা নিজস্ব স্বাভাবিক স্থান ছিল, এবং সমাজের কোনও মূল প্রয়োজনীয় ব্যাপার ও কর্ম্মে কোন বর্ণেরই একচেটিয়া

অধিকার ছিল না। এই বিশিষ্টতাটি মনে না রাখিলে প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা বুঝা যায় না; কিন্তু পরবর্ত্তী কালের পরিণাম দর্শন করিয়া এবং প্রধানতঃ অধঃপতনের যুগের অবস্থা হইতে যে সব ভুল ধারণার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে ঐ বিশিষ্টতাটিই ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা কিম্বা উচ্চতম অধ্যাত্মজ্ঞান ও সাধনার সুযোগ কোনটিই ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া ছিল না। প্রথম প্রথম আমরা দেখিতে পাই, অধ্যাত্মবিষয়ে নেতৃত্ব লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছে এবং ক্ষত্রিয়রা বহুকাল ধরিয়াই পণ্ডিত ও যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। তবে ব্রাহ্মণেরা স্মার্ত্ত, শিক্ষক, পুরোহিতরূপে তাহাদের সমস্ত সময় ও শক্তি দর্শনচর্চ্চা, বিদ্যাচর্চ্চা, শাস্ত্রচর্চ্চাতে দিতে পারিত বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহারাই জয়ী হয় এবং নিজেদের প্রাধান্য জাঁকাইয়া তোলে। এইরূপে পুরোহিত ও পণ্ডিত-সম্প্রদায়ই হয় ধর্ম্মবিষয়ে প্রামাণিক ব্যক্তি, শাস্ত্র ও ঐতিহ্যের রক্ষক, বিধিবিধান ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা, সকল বিদ্যার ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং সাধারণতঃ অন্যান্য শ্রেণীর ধর্ম্মগুরু; তাহাদের মধ্য হইতেই দেশের অধিকাংশ (যদিও কখনও সব নহে) দার্শনিক, মনীষী, সাহিত্যিক

ও বিদ্বান্ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। বেদ ও উপনিষদের অধ্যয়ন প্রধানতঃ তাহাদের হস্তেই চলিয়া যায়, যদিও উচ্চ তিন বর্ণের পক্ষেই সকল সময়ে উহা খোলা ছিল, শূদ্রগণের পক্ষে উহা নিয়মমত নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পর্য্যায়ক্রমে বহু ধর্ম্মান্দোলনের ফলে পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্তও প্রাচীন যুগের সেই স্বাধীনতা মূলতঃ বজায় ছিল, সেই সব ধর্ম্মান্দোলন উচ্চতম অধ্যাত্মজ্ঞান ও সাধনার সুযোগ লোকের দ্বারে দ্বারে আনিয়া দিয়াছিল, এবং যেমন আদিকালে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক ও বৈদান্তিক ঋষিগণের উদ্ভব সকল শ্রেণী হইতেই হইয়াছে, তেমনই শেষ পর্য্যন্ত সমাজের সকল স্তর হইতে, নিম্নতম শূদ্রদের মধ্য হইতে, এমন কি, ঘৃণিত ও পদদলিত অস্পৃশ্যদের মধ্য হইতেও যোগী, ঋষি অধ্যাত্মচিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তি, ধর্ম্মসংস্কারক, ধার্ম্মিক, কবি ও গায়কের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং তাহারা গতানুগতিক শাস্ত্র ও বিদ্যার অধিকারী না হইলেও তাহারাই যে জীবন্ত আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানের প্রকৃত উৎস, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চারি বর্ণ হইতে কালক্রমে দৃঢ়বদ্ধ উচ্চ-নীচ সামাজিক শ্রেণীবিভাগের আবির্ভাব হয়, কিন্তু পতিতদিগকে বাদ দিলে, প্রত্যেক শ্রেণীরই ছিল এক বিশেষপ্রকারের অধ্যাত্মজীবন ও উপযোগিতা, বিশেষপ্রকারের সামাজিক

মর্য্যাদা, বিশিষ্ট শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মের বিশিষ্ট আদর্শ এবং সমাজমধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান, কর্ত্তব্য ও অধিকার। আবার এই ব্যবস্থার দ্বারা আপনা হইতেই হইয়াছিল সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মবিভাগ এবং নিশ্চিত অর্থনীতিক সংস্থিতি; প্রথম প্রথম বংশানুক্রম নীতিই অনুসৃত হইত, যদিও এ ক্ষেত্রেও নিয়মে যত কড়াকড়ি, কার্য্যতঃ তত কড়াকড়ি ছিল না; কিন্তু প্রভূত ধন অর্জ্জন করিবার এবং আপন আপন শ্রেণীতে প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে সমাজ, শাসনবিভাগ ও রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার সুযোগ ও অধিকার হইতে কেহই বঞ্চিত ছিল না। কারণ, আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সমাজের এই উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ ছিল বলিয়া সেই সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রেও সে বিভাগ ছিল না। দেশবাসীর রাজনীতিক অধিকারে চারিবর্ণেরই নিজ নিজ অংশ ছিল এবং সাধারণ সমিতি ও শাসনবিভাগে তাহাদের নিজ স্থান, নিজ নিজ প্রভাব ছিল। আরও একটা কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, আইনের চক্ষুতে এবং অন্ততঃ থিওরি (theory) বা মতবাদে প্রাচীন ভারতের নারীগণ অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় রাজনীতিক অধিকারে বঞ্চিত ছিল না, যদিও নারীগণ সমাজে পুরুষের অধীন থাকায় এবং গৃহকর্ম্মেই সম্পূর্ণ ব্যাপৃত থাকায় এই সাম্য কেবলমাত্র

কতকগুলি ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলের পক্ষে কার্য্যতঃ ব্যর্থ হইয়াছিল। তথাপি এখনও যে সব প্রমাণপত্র পাওয়া যায়, তাহাতে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই যে, নারীগণ কেবলই যে রাণী ও শাসনকর্ত্রীরূপে, এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রেও (ভারতের ইতিহাসে এটি সাধারণ ঘটনা) খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, শুধু তাহাই নহে, তাহারা রাজনীতিক সভাসমিতিতেও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-রূপে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতের সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাটির ভিত্তিতে ছিল সকল শ্রেণীরই সাধারণ জাতীয় জীবনে অন্তরঙ্গভাবে অংশগ্রহণ ; প্রত্যেক শ্রেণী আপন আপন ক্ষেত্রে প্রাধান্য করিত, ধর্ম্ম ও বিদ্যার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ, রাজকার্য্য ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত রাষ্ট্রনীতিক কার্য্যের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়, ধনোপার্জ্জন ও অর্থনীতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈশ্য, কিন্তু কেহই, এমন কি, শূদ্ররাও রাজনীতিক জীবনে নিজ নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল না। রাষ্ট্রনীতি, শাসন ও বিচারকার্য্যে সকলেরই কথা চলিত, সকলেরই স্থান ছিল, প্রভাব ছিল। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, অন্যান্য দেশে যেরূপ শ্রেণীবিশেষ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবলভাবে অন্যান্য শ্রেণীর উপর একাধিপত্য করিয়াছে, ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থায় সেরূপ কোন এক বিশেষ শ্রেণীর একাধিপত্য, অন্ততঃ বেশী দিনের

জন্য, দাঁড়াইতে পারে নাই। তিব্বতের ন্যায় যাজক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাষ্ট্রশাসন, অথবা ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ভূস্বামী ও সামরিক অভিজাত-শ্রেণী কর্ত্তৃক যে শাসন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে, অথবা প্রাচীন কার্থেজ ও ভিনিসে স্বল্পসংখ্যক বৈশ্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে শাসন প্রচলিত ছিল, এ প্রকারের শাসনতন্ত্র ভারতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ। গোষ্ঠী, কুল ও বংশগুলি যখন বৃহত্তর জাতি ও রাজ্যে গড়িয়া উঠিতেছিল, এবং আধিপত্যের জন্য পরস্পরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল, সেই দেশব্যাপী যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব ও আত্মবিস্তারের সময়ে বড় বড় ক্ষত্রিয়-বংশগুলি রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে যে কতকটা প্রাধান্য লাভ করিত—মহাভারতে বর্ণিত ইতিহাস হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়; মধ্যযুগে রাজপুতনায় আবার কুলপ্রথার আবির্ভাব হইলে কতকটা সেইরূপ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের পুনরভিনয় হয়; কিন্তু প্রাচীন ভারতে এটা ছিল কেবল একটা সাময়িক অবস্থামাত্র, আর ঐরূপ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের দরুন রাষ্ট্রনীতিক ও নাগরিক ব্যাপারে অন্যান্য শ্রেণীর প্রভাব দূর হইত না, অথবা বিভিন্ন কম্যুন্যাল মূল অনুষ্ঠানের স্বাধীন জীবনে কোনপ্রকার দমনমূলক অত্যাচার বা হস্তক্ষেপ করা হইত না।

দেশের সমুদয় লোকই সাধারণ সমিতিগুলিতে কার্য্যতঃ

যোগ দিবে, এই যে প্রাচীন নীতি, মধ্যবর্ত্তী সময়ের সাধারণতান্ত্রিক রিপাব্‌লিকগুলিতেও এই নীতিটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হইত বলিয়া মনে হয়। সেগুলি প্রাচীন গ্রীস্‌দেশীয় সাধারণতন্ত্রের ন্যায় ছিল না। গ্রীক্ সাধারণতন্ত্রগুলি ছিল মুখ্যতন্ত্র রিপাবলিক (Oligarchical republics); সাধারণ সমিতিতে সকলে যোগদান করিতে পারিত না, সকল শ্রেণীর মুখ্য ও মান্য ব্যক্তি-গণকে লইয়া গঠিত ক্ষুদ্র সিনেটই (Senate) দেশ-শাসন করিত; ভারতে পরবর্ত্তী কালের রাজকীয় পরিষদ ও পৌরসমিতিগুলি এইরূপই ছিল। যাহাই হউক, শেষ পর্য্যন্ত যে রাষ্ট্ররূপের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা ছিল মিশ্রধরণের, তাহাতে কোন শ্রেণীকেই অযথা প্রাধান্য দেওয়া হইত না। এই জন্যই প্রাচীন গ্রীস ও রোম বা পরবর্ত্তী য়ুরোপের ন্যায় শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ভারতের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সহিত সাধারণের, মুখ্যতন্ত্র আদর্শের সহিত সাধারণতন্ত্র আদর্শের দ্বন্দ্বের ফলে শেষ পর্য্যন্ত একাধিপত্যশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্ত্তী য়ুরোপের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রকমের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। প্রথমে অভিজাতশ্রেণী আধিপত্য করিয়াছে; পরে কোথাও ধীরে

ধীরে, কোথাও বা বিপ্লবের দ্বারা, ধনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এই বুর্জ্জোয়া শাসন সমাজকে শিল্পতান্ত্রিক (industrialised) করিয়া তুলিয়াছে এবং জনসাধারণের নামে দেশকে শাসন ও শোষণ করিয়াছে ; অবশেষে এখন দেখা যাইতেছে, শ্রমিকশ্রেণী আধিপত্যলাভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এইরূপ শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ভারতের ইতিহাসে ঘটিতে পায় নাই। ভারতের মনোবৃত্তি ও প্রকৃতি পাশ্চাত্যের তুলনায় অধিকতর সমন্বয়শীল ও নমনীয়, পাশ্চাত্যের ন্যায় তর্কবুদ্ধিকে ধরিয়া না থাকিয়া বা শুধু প্রাণের আবেগে কাজ না করিয়া, তাহা সহজবোধ ও সহজানুভূতিরই বেশী অনুসরণ করিয়াছে ; সেই জন্য, যদিও অবশ্য তাহা সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, তথাপি অন্ততঃপক্ষে তাহা দেশের সকল স্বাভাবিক শক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে এমন একটা সুনিপুণ ও স্থায়ী সমন্বয়ে উপনীত হইতে পারিয়াছিল, যাহা সতত শঙ্কা-জনকভাবে দোদুল্যমান সাম্য বা একটা সাময়িক আপোষমাত্র ছিল না। সেই প্রাণবান্ ও সুব্যবস্থিত যথাক্রম সন্নিবেশে সমাজ-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ স্বাধীন-ভাবে আপন আপন কর্ম্ম করিতে পাইত এবং এই জন্যই তাহা, মানুষের সকল সৃষ্টিরই কালক্রমে যে অবনতি অবশ্যম্ভাবী তাহা রোধ করিতে না পারিলেও,

অন্ততঃ ভিতর হইতে বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রাষ্ট্রের শীর্ষদেশ অধিকার করিয়া ছিল তিনটি শাসন-বিষয়ক সংস্থান,—মন্ত্রণাপরিষদসহ রাজা, পৌর-সমিতি ও সাধারণ জানপদসমিতি। দেশের সকল শ্রেণীর লোক হইতেই পরিষদের সভ্য ও মন্ত্রিগণকে লওয়া হইত। পরিষদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রতিনিধিগণের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল। সংখ্যা হিসাবে বৈশ্যদেরই খুব প্রাধান্য ছিল, কিন্তু ইহাই ছিল ন্যায্য ব্যবহার, কারণ দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে তাহারাই ছিল সংখ্যায় বেশী; কারণ, আর্য্যসমাজের প্রথমাবস্থায় বৈশ্য শ্রেণীর মধ্যে শুধু যে বণিক ও ব্যবসায়িগণই গণ্য হইত তাহা নহে, কারিকর, শিল্পী ও কৃষকরাও বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, অতএব তাহারাই ছিল জনসাধারণের অধিকাংশ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র শ্রেণীর বিকাশ অপেক্ষাকৃত পরে হইয়াছিল, এবং উপরের দুইটি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব যতই বেশী থাকুক, সংখ্যায় এই তিনটি শ্রেণীই খুব ন্যূন ছিল। পরে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং কাল্‌চারের অবনতির যুগে ব্রাহ্মণগণ সমাজকে পুনর্গঠিত করেন, তখন ভারতের অধিকাংশ স্থানে কৃষক, শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসাদারগণ বেশীর ভাগই শূদ্র

পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িল, শীর্ষদেশে রহিল অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের দল এবং মধ্যস্থলে কতকগুলি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছড়াইয়া রহিল।

পরিষদ এই ভাবে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হইয়া রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্য্যনির্ব্বাহক ও শাসন-সংস্থান ছিল; শাসনকার্য্য, অর্থনীতি, কূটনীতি এই সকল বিষয়ে অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে, সমাজের সমুদয় স্বার্থব্যাপারে, রাজা যে-কার্য্য বা আদেশ প্রচার করিতেন, সে জন্য তাঁহাকে পরিষদের সম্মতি ও সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হইত। রাজা, মন্ত্রিগণ ও পরিষদ ইঁহারাই বিভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহক বোর্ডের সাহায্যে ষ্টেটের কার্য্যের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেন। কালক্রমে রাজার শক্তি যে বাড়িয়া উঠে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রেরণা অনুসারে কাজ করিবার খুবই প্রলোভন হইত, কিন্তু তাহা হইলেও, যত দিন ঐ রাষ্ট্রব্যবস্থা সতেজ ছিল, তত দিন রাজা পরিষদ ও মন্ত্রিগণের মত ও ইচ্ছাকে অমান্য বা অগ্রাহ্য করিয়া পরিত্রাণ পাইতেন না। এমন কি, মহাসম্রাট অশোকের ন্যায় শক্তিশালী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজাকেও পরিষদের সহিত দ্বন্দ্বে পরাজিত হইতে হইয়াছিল এবং কার্য্যতঃ তিনি তাঁহার ক্ষমতা ত্যাগ

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। পরিষদ-সহ মন্ত্রিগণ অবাধ্য বা অযোগ্য নৃপতিকে সরাইয়া তাঁহার স্থলে তাঁহার বংশের অথবা নূতন কোন বংশের অন্য লোককে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন, এবং বস্তুতঃ বার বার এরূপ করিয়াছেন। এই ভাবেই কয়েকটি ইতিহাসবিখ্যাত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, যথা—মৌর্য্যবংশের স্থানে সুঙ্গ-বংশের প্রতিষ্ঠা, পুনশ্চ কানোয়া সম্রাটবংশের সূচনা। রাষ্ট্রনীতিক মতবাদ অনুসারে এবং সচরাচর ব্যবহারেও রাজার সমস্ত কর্ম্মই ছিল মন্ত্রিগণের সাহায্যে সপারিষদ রাজার কর্ম্ম; তাহাদের মতানুযায়ী হইলে, এবং ধর্ম্মানুসারে যে কার্য্যের ভার রাজার উপর অর্পিত হইয়াছে সেই সব কার্য্যের সহায়ক হইলে, তবেই রাজার ব্যক্তিগত কর্ম্মসকল বৈধ বলিয়া সাব্যস্ত হইত। আবার যেমন পরিষদ ছিল যেন একটি ঘনীভূত শক্তিরূপ ও কর্ম্মকেন্দ্র, সুবিধামত পরিসরের মধ্যে চারি বর্ণের প্রতিনিধি, সমাজশরীরের সকল প্রধান অংশের সারসংগ্রহ, তেমনই রাজাও ছিলেন ঐ শক্তিকেন্দ্রেরই সক্রিয় মস্তকস্বরূপ, তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে; স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের ন্যায় তিনিই ষ্টেট বা তিনিই দেশের মালিক বা অনুগত প্রজাগণের উপর দায়িত্বহীন শাসনকর্ত্তা হইতে পারিতেন না। প্রজাদের আনুগত্য ছিল আইনের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, তাহারা

সপারিষদ রাজার আদেশসকল কেবল এই জন্যই পালন করিত যে, সেইগুলি ছিল ধর্ম্মের প্রয়োগ ও সংরক্ষণের উপায়স্বরূপ।

তবে পরিষদের ন্যায় ক্ষুদ্র সংস্থানই যদি শাসন-বিষয়ক একমাত্র অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইলে সর্ব্বদা রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণের অতি নিকট প্রভাবের অধীন থাকায় তাহা ক্রমে স্বেচ্ছাচারী শাসনের যন্ত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারিত। কিন্তু ষ্টেটের মধ্যে আরও দুইটি শক্তিশালী অনুষ্ঠান ছিল। সেগুলি ছিল আরও বিস্তৃতভাবে সমাজ-জীবনের প্রতিনিধি। সাক্ষাৎ রাজকীয় প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া তাহারা আরও নিকট ও অন্তরঙ্গভাবে সমাজের মন প্রাণ ও ইচ্ছাকে প্রকাশ করিত, সর্ব্বদা বহুল পরিমাণে শাসনকার্য্য পরিচালন ও শাসনবিষয়ক আইনকানুন প্রণয়ন করিত, এবং সকল সময়েই রাজশক্তিকে সংযত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত। কারণ, তাহারা অসন্তুষ্ট হইলে অপ্রিয় বা অত্যাচারী রাজাকে দূর করিয়া দিতে পারিত, অথবা যতক্ষণ সে প্রজাগণের ইচ্ছার সম্মুখে মাথা নত না করিতেছে, ততক্ষণ তাহার শাসনকার্য্য অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারিত। এই দুইটি মহৎ অনুষ্ঠান হইতেছে পৌরসমিতি ও জানপদ-সমিতি; ইহারা আপন আপন স্বতন্ত্র কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বসিত, আবার সর্ব্ব-

সাধারণের স্বার্থবিষয়ক ব্যাপারে উভয়ে একত্র বসিত। * পৌর-সমিতি রাজ্য বা সাম্রাজ্যের রাজধানীতে সর্ব্বদাই বসিত,—সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার অধীনে প্রদেশগুলির প্রধান নগরীতেও ঐরূপ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সমিতির অধিবেশন হইত বলিয়া আভাস পাওয়া যায়; নগরের মধ্যস্থিত শিল্প ও ব্যবসাসম্বন্ধীয় সঙ্ঘ বা গিল্ডগুলির (City Guilds) এবং সমাজের সকল শ্রেণীর—অন্ততঃ নীচের তিনটি শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি-সঙ্ঘের (Caste bodies) নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে লইয়া ঐরূপ পৌর-সমিতি গঠিত হইত। নগরে ও দেশে সর্ব্বত্র বৃত্তিসঙ্ঘ (guilds) ও জাতিসঙ্ঘগুলি ছিল সমাজ-শরীরের জীবন্ত স্বায়ত্তশাসনশীল অঙ্গ; আর নাগরিকগণের যে শ্রেষ্ঠ সমিতি, সেটি কৃত্রিমভাবে প্রতিনিধিমূলক ছিল না, পরন্তু তাহা ছিল নগরের চতুঃসীমার অন্তর্গত সমগ্র জীবনধারার বাস্তবিক প্রতিনিধি। উহা নগরের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত, কখনও সাক্ষাৎ ভাবে নিজেই কার্য্য করিত, কখনও বা নিজের অধীনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নানা সমিতি বা

---

* এই অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে তথ্য মিঃ জয়াসোয়ালের (Mr. Jayaswal) জ্ঞানগর্ভ ও বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রমাণযুক্ত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে; আমার বর্ত্তমান আলোচনায় যেগুলি প্রাসঙ্গিক কেবল সেই কথাগুলিই আমি এখানে বাছিয়া লইয়াছি।

কার্য্যনির্ব্বাহক বোর্ড পাঁচ, দশ বা অধিকসংখ্যক সভ্যের দ্বারা গঠন করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া কার্য্য করিত; উহার আইন ও অনুশাসন সকল বৃত্তিসঙ্ঘকেই মানিয়া চলিতে হইত, আবার সাক্ষাৎভাবেও উহা নাগরিক সমাজের ব্যবসা, শিল্প, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতিবিষয়ক ব্যাপার-সমূহ পরিচালিত করিত। ইহা ছাড়া ঐ সমিতি এমন শক্তিশালী ছিল যে, রাজ্যের বৃহত্তর ব্যাপারেও উহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত, এবং এই সকল ব্যাপারে উহা কখনও জানপদ সমিতির সহযোগে, কখনও বা পৃথক্‌ভাবে নিজেই কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে পারিত; আর, উহা সর্ব্বদা রাজধানীতে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য করিত বলিয়া এমন ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, রাজা, তাঁহার মন্ত্রিগণ ও তাঁহাদের পরিষদকে সর্ব্বদাই উহাকে মান্য করিয়া চলিতে হইত। রাজার মন্ত্রী ও শাসনকর্ত্তাদের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে দূরবর্ত্তী প্রাদেশিক পৌরসমিতিগুলিও নিজেদের অসন্তোষ কার্য্যকরীভাবে প্রকাশ করিতে পারিত, তাহাদের মর্য্যাদা বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইলে সমুচিত উত্তর দিতে পারিত, এবং অপরাধী কর্ম্মচারীকে সরাইয়া লইতে বাধ্য করিতে পারিত।

জানপদ সমিতিও এই ভাবেই রাজধানীর বাহিরে সমস্ত দেশের মন ও ইচ্ছার বাস্তবিক প্রতিনিধি ছিল,

কারণ, উহা নগর ও গ্রামের নির্ব্বাচিত নেতা বা মুখ্যগণকে লইয়া গঠিত ছিল। মনে হয়, ইহার গঠনে ধনিক সম্প্রদায়ের কতকটা প্রভাবাধিক্য হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ, অধীনস্থ সম্প্রদায়সকলের প্রধানতঃ অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিরাই ইহাতে প্রতিনিধি হইয়া আসিত, অতএব এই জানপদ সমিতি সম্পূর্ণভাবে সাধারণতান্ত্রিক ছিল না (যদিও অতি আধুনিক সমিতিগুলি ব্যতীত সর্ব্বত্রই ক্ষত্রিয়বৈশ্যের ন্যায় শূদ্ররাও স্থান পাইত), তথাপি উহা যথেষ্টভাবেই জনসাধারণের প্রকৃত জীবন ও মনোভাব প্রকাশ করিত। যাহাই হউক, এইটি একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক সমিতি ছিল না, কারণ, রাজা, রাজপরিষদ ও পৌর সমিতির মতই এইটিরও মূল আইন প্রণয়ন করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না, ইহা কেবল ব্যবহারিক বিধান ও মীমাংসা করিতে পারিত। ইহার কার্য্য ছিল জাতীয় জীবনের বিভিন্ন কর্ম্ম-পরম্পরার মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনে দেশবাসীর ইচ্ছার সাক্ষাৎ যন্ত্র হওয়া, এই সব যাহাতে যথাযথ ভাবে পরিচালিত হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা, দেশের বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সাধারণভাবে শৃঙ্খলা ও কল্যাণবিধান করা, এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক বিধান ও অনুশাসন প্রচার করা, রাজা ও তাঁহার পরিষদের নিকট হইতে সুবিধা ও অধিকার-

সকল আদায় করা, রাজার কার্য্যে প্রজাদের অনুমতি প্রকাশ করা বা প্রত্যাহার করা এবং প্রয়োজন হইলে রাজাকে কার্য্যতঃ বাধা প্রদান করা, কুশাসন নিবারণ করা, অথবা দেশের প্রতিনিধিদের পক্ষে যে সব পথ খোলা আছে সেই সবের দ্বারা ঐরূপ শাসনের শেষ করা। কাহার পর কে রাজা হইবে সে বিষয়ে পৌর জানপদের সংযুক্ত অধিবেশনের পরামর্শ লওয়া হইত, ঐরূপ সংযুক্ত অধিবেশন রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিত, যে বংশ রাজত্ব করিতেছিল তাহার বাহিরে অন্য ব্যক্তিকে সিংহাসন অর্পণ করিতে পারিত, রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট মকদ্দমায়, দেশদ্রোহিতায় বা বিচার-বিভ্রাটে কখন কখনও দেশের উচ্চতম বিচারালয়রূপে বিচারকার্য্য করিতে পারিত। রাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজকীয় মন্তব্য এই সমিতিগুলিতে পেশ করা হইত, এবং বিশেষ টেক্সনির্দ্ধারণ, যুদ্ধ, যজ্ঞ, জলসেচনের বৃহৎ ব্যাপার এবং দেশের অন্যান্য অত্যাবশ্যক ব্যাপারে তাহাদের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইত। এই দুই সমিতির অধিবেশন অনবরতই হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রত্যহ রাজার নিকট হইতে নানা বিষয় তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইত, তাহাদের কার্য্য রাজা রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতেন, অমনই সেগুলি আইনরূপে বলবৎ হইত। বস্তুতঃ তাহাদের অধিকারসকল ও কার্য্যপরম্পরা

সমগ্রভাবে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাজাধিপত্যে তাহারা ছিল অংশীদার, শাসন-ব্যাপারে তাহাদের অধিকার ছিল স্বতঃসিদ্ধ, এবং যে সব শক্তিপ্রয়োগ সাধারণতঃ তাহাদের কার্য্যের অন্তর্গত ছিল না, অসাধারণ প্রয়োজনের সময়ে তাহারা সে সবও ব্যবহার করিতে পারিত। ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, সম্রাট অশোক যখন দেশের ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তিনি কেবল রাজানুশাসনের দ্বারাই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, পরন্তু তিনি সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন কালে এই দুইটি সমিতিকে যে রাজ্যের কার্য্য-নির্ব্বাহক বলিয়া এবং প্রয়োজনমত রাজ-শাসনে বাধা দিবার যন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইত, তাহা সম্পূর্ণভাবেই ঠিক বলিয়া মনে হয়।

এই মহান্ অনুষ্ঠানগুলি কখন বিলুপ্ত হয়? মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে, না বিদেশী শাসনের ফলে, তাহা ঠিক জানা যায় না। ভারতীয় রাষ্ট্রের যেরূপ গঠন তাহাতে যদি ইহা এমন কোন ভাবে উপর দিকে শিথিল হইয়া পড়িত, যাহার ফলে রাজার শাসন ও সমাজ-রাষ্ট্র-শরীরের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, এবং রাজা এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া ও জাতির বৃহত্তর ব্যাপারগুলিতে অবাধ আধিপত্য লাভ করিয়া ক্রমশঃ বেশী বেশী স্বেচ্ছাচারী হইয়া

পড়িতেন, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি কেবল নিজেদের ভিতরকার ব্যাপার লইয়াই ব্যাপৃত থাকিত (যেমন শেষ পর্য্যন্ত গ্রামসঙ্ঘগুলি হইয়া পড়িয়াছিল), কিন্তু রাষ্ট্রের বৃহত্তর ব্যাপারগুলির সহিত কোনরূপ জীবন্ত সম্বন্ধ না রাখিত, তাহা হইলে রাষ্ট্র খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, কারণ, এই মিশ্র কম্যুন্যাল স্বায়ত্তশাসন-মূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকল অংশের সংযোগ ও সমন্বয় একান্ত আবশ্যক। যাহাই হউক, মধ্য-এসিয়া হইতে যে-আক্রমণ ভারতের উপর আসিয়া পড়িল, এবং সঙ্গে করিয়া আনিল এমন ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতামূলক শাসনের রীতি যাহা কোনরূপ বাধা মানিতে মোটেই অভ্যস্ত ছিল না, তাহা যে এই স্বাধীনকর্ত্তৃত্বশীল অনুষ্ঠান সকলকে বা তাহাদের অবশেষকে সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ; বস্তুতঃ সমগ্র উত্তর-ভারতে ইহাই ঘটিয়াছিল। তাহার পর বহু শতাব্দী ধরিয়া দক্ষিণ দেশে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে যে সাধারণ সমিতি-গুলি বর্ত্তমান রহিল, প্রাচীন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলির ন্যায় তাহাদের গঠন ছিল বলিয়া বোধ হয় না, পরন্তু প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলি যে সব কম্যুন্যাল সঙ্ঘ ও সমিতিকে পরস্পরের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট করিয়া উপরিতন শক্তিরূপে সেইগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিত, দক্ষিণ দেশের

সাধারণ সমিতিগুলি ছিল সেই সব নিম্নতন অনুষ্ঠানের ন্যায়। এই নিম্নতন অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল কুল ও গণ, পূর্ব্বে এইগুলির রাজনীতিক স্বরূপ ছিল, প্রাচীন কুলপ্রথামূলক জাতির এইগুলিই ছিল উচ্চতম শাসন-সমিতি। নূতন ব্যবস্থায় তাহারা বর্ত্তমান রহিল, কিন্তু তাহাদের উচ্চতম অধিকার সকল হারাইল, তাহারা কেবল নিম্নতন শক্তিরূপে সীমাবদ্ধভাবে তাহাদের অন্তর্গত সম্প্রদায়গুলির কার্য্যপরম্পরা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। কুল তাহার রাজনীতিক ক্ষমতা হারাইবার পরেও বর্ত্তমান রহিল ধর্ম্ম ও সমাজবিষয়ক অনুষ্ঠানরূপে, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নিজের কুলধর্ম্ম (সামাজিক ও ধার্ম্মিক রীতিনীতির ঐতিহ্য) এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কুলসঙ্ঘও (সাম্প্রদায়িক সমিতি) বজায় রাখিল। দক্ষিণ-ভারতে যে-সব সাধারণ সমিতি সে-দিন পর্য্যন্ত প্রাচীন সাধারণ সমিতির স্থান অধিকার করিয়াছিল, কতকগুলি পাশাপাশি থাকিয়া কখনও একত্র কখনও বা স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিত, সেইগুলি ছিল এইরূপ অনুষ্ঠানেরই প্রকারভেদ। রাজপুতনাতেও কুল তাহার রাজনীতিক স্বরূপ ও শক্তি পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, কিন্তু অন্য ধরণে; প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলি এবং তাহাদের সুমার্জ্জিত ব্যবহার আর ফিরিয়া আসে নাই, যদিও তাহা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মোচিত সাহস, সৌজন্য,

উদারতা ও মর্য্যাদাজ্ঞান অনেক পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতীয় কমুন্যাল ব্যবস্থায় আর একটি অধিকতর স্থিতিশক্তিসম্পন্ন জিনিষ ছিল, সেটি প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্যের কাঠামোতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত চাতুর্ব্বর্ণ্যেরই স্থান অধিকার করিয়া অসাধারণ জীবনীশক্তি ও প্রভাবশীল প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সেইটি হইতেছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জাতিভেদ প্রথা। আজ সেইটির ম্রিয়মাণ অবস্থা হইলেও, সেটি এখনও নড়িতে চাহিতেছে না। নানা শক্তির চাপে প্রাচীন চারি বর্ণের মধ্যে নানা বিভাগ উৎপন্ন হয়, আদিতে সেই সব বিভাগ হইতেই জাতিভেদের উদ্ভব। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে নানা বিভাগের উদ্ভব হয়, তাহার প্রধান কারণ ছিল ধর্ম্ম, সমাজ ও আচার-অনুষ্ঠান-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন রীতি-নীতি, কিন্তু স্থানভেদ ও দেশভেদের ফলেও নানা শ্রেণীভেদ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়রা অধিকাংশ এক শ্রেণীই ছিল, যদিও তাহারা বিভিন্ন কুলে বিভক্ত ছিল। অন্যপক্ষে বৈশ্য ও শূদ্রগণ, অর্থনীতিক কর্ম্ম-বিভাগের প্রয়োজনবশে বংশানুক্রমনীতি অনুসারে অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে ক্রমশঃ বেশী বেশী কড়াকড়ির সহিত বংশানুক্রমনীতি অনুসৃত হইয়াছিল, নতুবা এইরূপ স্থায়িভাবে অর্থনীতিক কর্ম্ম-

বিভাগ অন্যান্য দেশের ন্যায় গিল্ড্ বা বৃত্তিসঙ্ঘ গঠন করিয়া সম্পন্ন হইতে পারিত। বস্তুতঃ নগরসকলে আমরা শক্তিশালী ও দক্ষ গিল্ড্ প্রথার * অস্তিত্ব দেখিতে পাই। কিন্তু কালক্রমে এই প্রথা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে এবং অধিকতর ব্যাপক জাতিভেদপ্রথাই সর্ব্বত্র অর্থনীতিক কর্ম্মবিভাগের একমাত্র ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়। নগরে ও গ্রামে জাতি ছিল স্বতন্ত্র কম্যুন্যাল মূল অনুষ্ঠান, উহা ছিল একই সঙ্গে ধর্ম্ম, সমাজ ও অর্থনীতিবিষয়ক সঙ্ঘ, নিজের ধার্ম্মিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রশ্নের মীমাংসা নিজেই করিত, এবং নিজের অন্তর্গত লোকসকলের উপর আধিপত্য করিত, তাহাতে বাহিরের কেহ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। কেবল ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রশ্নসকল সমাধানে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ব্যাখ্যা ও বিধানই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইত। যেমন কুলের তেমনই প্রত্যেক জাতিরও জাতিধর্ম্ম অর্থাৎ জীবনযাত্রা ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে নিজ নিজ বিশিষ্ট রীতি-নীতি ছিল, এবং জাতির কম্যুন্যাল বা সমষ্টিগত জীবনের মুখপাত্রস্বরূপ জাতীয় সমিতি বা জাতিসঙ্ঘ ছিল।

---

* গিল্ড্ (Guild) বলিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ বুঝায়। প্রাচীন ভারতে ইহাদিগকে "শ্রেণী" বা "পূগ" বলা হইত। নগরের গিল্ড্ সমূহকে সাধারণভাবে "নৈগম" বলা হইত। —অনুবাদক।

ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা তাহার সকল অনুষ্ঠানেই কম্যুন্যাল বা সমষ্টিগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ব্যষ্টিগত ভিত্তির উপর নহে। সেই হেতু রাজ্যের রাষ্ট্রনীতিক ও শাসনসম্বন্ধীয় ব্যাপারে জাতিকেও গণ্য করা হইত। গিল্ডগুলিও ব্যবসা ও শিল্পবিষয়ক মূল কম্যুন্যাল অনুষ্ঠানরূপে সেই রকমই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিত, তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহ ও আলোচনার জন্য সভায় সমবেত হইত; আবার তাহাদের মিলিত সভাও ছিল, বোধ হয় সেই মিলিত সভাগুলিই এককালে নগরের শাসকসমিতিরূপে কার্য্য করিত। শাসনকার্য্য-নির্ব্বাহক এই গিল্ড্‌গুলি (সেগুলি কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যালিটী ছিল না) কালক্রমে অধিকতর ব্যাপক নাগরিক সমিতিতে পর্য্যবসিত হয়। এই শেষোক্ত সমিতি নগরের সমস্ত গিল্ড্‌ ও সমস্ত বর্ণের অন্তর্গত জাতিসঙ্ঘগুলির মিলিত প্রতিনিধি ছিল। জাতিগুলি জাতি হিসাবে রাজ্যের সাধারণ সমিতিতে সাক্ষাৎ-ভাবে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত না বটে, কিন্তু স্থানীয় ব্যাপারের কার্য্য নির্ব্বাহে তাহাদের নিজস্ব অধিকার ছিল।

গ্রামসঙ্ঘ ও নগরসঙ্ঘ, এই দুইটি ছিল সমগ্র রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট স্থায়ী ভিত্তি; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এইগুলি কেবল স্থানভাগ মাত্র ছিল না, অথবা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন, শাসনকার্য্য

নির্ব্বাহ বা অন্যান্য সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক উদ্দেশ্য-সাধনের সুবিধাজনক যন্ত্রমাত্র ছিল না, পরন্তু সেগুলি সকল সময়ে সত্য সত্যই মূল কমুন্যাল অনুষ্ঠান বা সমষ্টিজীবনের জীবন্ত সঙ্ঘ ছিল। তাহাদের ছিল নিজস্ব স্বতন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত জীবন, তাহা নিজের ভিতরের প্রেরণায়, নিজের শক্তিতে কার্য্য করিত, কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের একটা নিম্নতন অংশরূপেই কার্য্য করিত না। গ্রামসঙ্ঘকে ক্ষুদ্র গ্রাম্য রিপাব্‌লিক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং এই বর্ণনায় কিছুমাত্র অত্যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, প্রত্যেক গ্রাম ছিল আপন সীমার মধ্যে স্বাধীন ও স্বনির্ভরশীল, নিজের নির্ব্বাচিত পঞ্চায়েত ও নির্ব্বাচিত বা বংশানুক্রমিক কর্ম্মচারীর দ্বারা শাসিত হইত, নিজের শিক্ষা, শান্তিরক্ষা, বিচার এবং সমস্ত অর্থনীতিক প্রয়োজনসাধনের ব্যবস্থা করিত, স্বাধীন স্বায়ত্তশাসনমূলক মৌলিক অনুষ্ঠানরূপে নিজের জীবন নিজেই নিয়ন্ত্রিত করিত। গ্রামগুলির পরস্পরের সহিত কার্য্যও তাহারা নানাভাবে সম্মিলিত হইয়া সম্পাদন করিত; কতকগুলি গ্রাম মিলিয়া এক এক জন নির্ব্বাচিত বা বংশানুক্রমিক নেতার অধীনে সমষ্টিবদ্ধ হইত এবং এইরূপ গ্রামসমষ্টিরও একটা স্বাভাবিক সমষ্টিগত জীবন ছিল, যদিও তাহা অপেক্ষাকৃত শিথিলভাবেই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল।

কিন্তু, ভারতের নগরসঙ্ঘগুলিও কম স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনশীল অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া মনে হয় না, সেগুলি নিজেদের সভা ও সমিতির দ্বারা শাসিত হইত, তাহাদের নির্ব্বাচনপ্রথা ছিল, ভোটের ব্যবহার ছিল। নিজেদের স্বাধিকারে তাহারা নিজেদের ব্যাপার পরিচালনা করিত এবং গ্রামগুলির ন্যায়ই রাজ্যের সাধারণ সমিতি জানপদে প্রতিনিধি প্রেরণ করিত। নাগরিক শাসনপ্রণালীর অন্তর্গত ছিল সে সমুদয় কর্ম্ম, যাহা নগরবাসীর আর্থিক বা অন্যান্য কল্যাণের অনুকূল, যথা, শান্তিরক্ষা, বিচার, রাস্তাঘাট আদি নির্ম্মাণ ও মেরামত, ধর্ম্মস্থান প্রভৃতি সংরক্ষণ, রেজিষ্ট্রেশন, মিউনিসিপ্যাল টেক্স নির্দ্ধারণ এবং ব্যবসা, শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাপার সকলের ব্যবস্থা। যদি গ্রামসঙ্ঘকে ক্ষুদ্র রিপাব্লিক বলিয়া বর্ণনা করা চলে, তাহা হইলে নগরসঙ্ঘগুলিকেও সেইরকম বৃহত্তর নাগরিক রিপাব্লিক বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, নৈগম ও পৌর সমিতিগুলি নিজেদের মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারিত, অন্যথা এ ক্ষমতা কেবল রাজা বা রাজশক্তির হস্তেই ছিল।

আর একপ্রকার সমষ্টি-জীবনের উল্লেখ করা আবশ্যক। তাহাদের কোনরূপ রাজনীতিক অস্তিত্ব ছিল না, তথাপি সেগুলি আপন আপনভাবে স্বায়ত্তশাসনমূলক অনুষ্ঠান

ছিল ; এইগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রবল ঝোঁক হইতেছে নিবিড়ভাবে কম্যুন্যাল বা সমষ্টিগত রূপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ। একটি উদাহরণ, যৌথ পরিবার ; ভারতের সর্ব্বত্রই ইহা প্রচলিত এবং কেবল আধুনিক অবস্থার চাপে ইহা এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ; এই যৌথপরিবারের দুইটি মূলসূত্র হইতেছে, প্রথমতঃ এক বংশে যাহারা জন্মিয়াছে এবং তাহাদের পরিবারবর্গ সকলে মিলিয়া সমষ্টিগতভাবে সম্পত্তি ভোগ করা, ও পরিবারের যিনি প্রধান ব্যক্তি তাঁহার অধীনে যতদূর সম্ভব অবিভক্ত কম্যুন্যাল জীবন যাপন করা, দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে পিতার সম্পত্তিতে সমান অংশে স্বত্ববান্. হওয়া, সম্পত্তির বিভাগ হইলেই সে এই অংশ দাবী করিতে পারে। এই কম্যুন্যাল ঐক্য অথচ সেই সঙ্গেই ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্থায়ী স্বত্বাধিকার, ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায়, ভারতীয় জীবনধারা ও মনোভাব কেমন সমন্বয়ের পক্ষপাতী, জীবনের মূল সত্যগুলিকে কেমন ইহা স্বীকার করিয়া চলে এবং সাধারণ ব্যবহারে সেগুলি পরস্পরের বিরোধী প্রতীয়মান হইলেও কেমন করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করে। সমন্বয়ের দিকে এইরূপ প্রবৃত্তিই ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্রের সকল অংশে

বিভিন্ন ভাবে যাজক, রাজকীয়, আভিজাতিক, ধনিক ও সাধারণতান্ত্রিক ধারা সকলের সামঞ্জস্যসাধন করিয়া এমন এক সমগ্রতার বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, যাহার উপরে ইহাদের কোন একটিরই বিশিষ্ট ছাপ পড়িবে না, তাহা কতকগুলা ঠেক-ঠাক দিয়া কিম্বা কোন মনগড়া থিওরি বা মতবাদ অনুসরণ করিয়া কেবল একটা বাহ্য মিটমাট বা মিশ্রণমাত্র হইবে না, পরন্তু তাহা হইবে জটিল বহুমুখী সমাজ-মন ও প্রকৃতির সহজাত সংস্কার ও স্বরূপের স্বাভাবিক বাহ্য প্রকাশ।

আর একদিকে, ভারতীয় জীবনের বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতার সীমায় আমরা দেখিতে পাই, ধর্ম্মবিষয়ক সমাজ। আবার ইহাও কম্যুন্যাল রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। আদি বৈদিক সমাজে চার্চ্চ বা ধর্ম্মসঙ্ঘ বা যাজক সম্প্রদায়ের কোনও স্থান ছিল না। কারণ, সে ব্যবস্থায় সমুদয় লোক ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবিষয়ে একীভূত সমগ্র জীবনে সংবদ্ধ ছিল, ঐহিক ও ধার্ম্মিক, যাজক ও সাধারণ ব্যক্তি, এরূপ কোনও ভেদ ছিল না এবং পরে নানামুখী বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম্ম মোটের উপর, অন্ততঃ ভিত্তিরূপে, এই নীতিটিকেই ধরিয়া রাখিয়াছে। অন্য পক্ষে ক্রমশঃ সন্ন্যাসের দিকে বেশী বেশী ঝোঁক হওয়ার ফলে ধর্ম্মজীবনের সহিত ঐহিক জীবনের ভেদ করা হয়, এবং স্বতন্ত্র ধর্ম্মসঙ্ঘ গঠনের প্রবৃত্তি জন্মায়,

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে সেই প্রবৃত্তি স্থায়ী ভাব গ্রহণ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়েই সুসম্বদ্ধ ধর্ম্মসঙ্ঘের পূর্ণ মূর্ত্তি প্রথম বিকসিত হয়। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, বুদ্ধ ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের সুবিদিত নীতিগুলিই সন্ন্যাসজীবনগঠনে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে সম্প্রদায় হইবে ধর্ম্মসঙ্ঘ, প্রত্যেক মঠ হইবে এক একঠি ধর্ম্মমূলক কমিউন্ (Religious commune), তাহা সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর জীবন যাপন করিবে। বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মপালনই হইবে তাহার সকল নিয়ম, লক্ষণ ও জীবনযাপন-প্রণালীর ভিত্তি ও আদর্শ। ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, ঠিক এইটিই ছিল সমগ্র হিন্দু সমাজের মূল নীতি ও আদর্শ। তবে এখানে আধ্যাত্মিক ও কেবল ধর্ম্ম-জীবনের ক্ষেত্র বলিয়া সেটিকে উচ্চতর প্রগাঢ়তা দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল। এই সঙ্ঘ ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কম্যুন্যাল অনুষ্ঠানগুলির ন্যায়ই নিজের কার্য্যাদি পরিচালন করিত। ভিক্ষুমণ্ডলী সমিতিতে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার্য্য প্রশ্নের আলোচনা করিত, এবং রিপাবলিকের সভাগৃহগুলির ন্যায় এখানেও ভোটের দ্বারা মীমাংসা করা হইত, তবে যাহাতে অতিমাত্রায় ডেমক্রেটিক প্রণালীর আনুষঙ্গিক দোষগুলি ঘটিতে না পারে, তাহারও প্রতিবিধান করিবার ব্যবস্থা

ছিল। এই মঠপ্রথা এইরূপে একবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, পরে বৌদ্ধদের নিকট হইতে গোঁড়া হিন্দুগণ সেটি গ্রহণ করে, তবে সেরূপ সবিস্তার ব্যবস্থা নহে। এইরূপে গঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি যেখানেই প্রাচীন ব্রাহ্মণতন্ত্র অপেক্ষা প্রভাবশালী হইতে পারিয়াছিল—যেমন শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট সম্প্রদায়—সেইখানেই সেগুলি সমাজের সাধারণ অধিবাসিগণের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নেতা হইয়া উঠিয়াছিল, তবে তাহারা কখনই রাজ-নীতিক শক্তি অধিকার করিবার স্পর্দ্ধা করে নাই, এবং চার্চ্চ ও ষ্টেটের মধ্যে সংগ্রাম ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতের সমগ্র জীবন, বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলির সময়েও, তাহার প্রাথমিক নীতি ও মূল কর্ম্মধারা বজায় রাখিয়াছিল, এবং তাহার সমাজ-রাষ্ট্রব্যবস্থা মূলতঃ ছিল স্ব-নিয়ন্ত্রিত স্বায়ত্ত-শাসনশীল সঙ্ঘসকল লইয়া গঠিত বহুমুখী জটিল সংস্থান। এই সংস্থানের উপরে সুসম্বদ্ধ ষ্টেট্-আধিপত্যের বিকাশ অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভারতেও প্রয়োজন হইয়াছিল দুই কারণে; অংশতঃ এই কারণে যে, সমাজে স্বভাবতঃ যে শিথিল শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি বিকশিত হয়, তাহা অল্পপরিসর জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও, সমাজের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কার্য্যকরী বুদ্ধি তাহাতে

সন্তুষ্ট না হইয়া আরও সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা ও সঙ্গতিবিধান করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু আরও বিশেষ কারণ হইয়াছিল এই যে, যুদ্ধ, আক্রমণ, আত্ম-রক্ষা প্রভৃতি সামরিক ব্যাপারের সুব্যবস্থা এবং অন্যান্য দেশের সহিত কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার এক কেন্দ্রীভূত শক্তির হস্তে ন্যস্ত করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ষ্টেটের বিস্তারের দ্বারা হয় ত প্রথম প্রয়োজনটি সিদ্ধ হইতে পারিত, কারণ, ইহার মধ্যে সে সম্ভাবনা এবং তদুপযোগী নানা অনুষ্ঠানও ছিল, কিন্তু রাজতন্ত্রের প্রণালী অধিকতর সঙ্কুচিত ও সহজ কেন্দ্রানুগতার জন্য অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ও দক্ষতর অনুষ্ঠান বলিয়াই প্রতীত হইয়াছিল। আর বাহিরের কাজটির জন্য গণতন্ত্র ভারতের উপযোগী হয় নাই। কারণ, প্রাচীনকালে ভারতকে একটা দেশ না বলিয়া মহাদেশ বলাই ঠিক হইত, এবং এই বিরাট মহাদেশকে রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যে বদ্ধ করা প্রথম হইতেই এক যুগযুগব্যাপী কঠিন সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় গণতন্ত্র তাহার সুদক্ষ সামরিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, উহা আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষা করিতেই অধিকতর শক্তিশালী ছিল। এইজন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও রাজতন্ত্রের শক্তিশালী অনুষ্ঠানই শেষ

পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছিল এবং অন্য সমুদয়কে গ্রাস করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গেই ভারতের মনীষা নিজ মূল স্বানুভূতি ও আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাবশতঃ ভারতবাসীর প্রকৃতি অনুযায়ী কম্যুন্যাল স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি বজায় রাখিয়াছিল, রাজতন্ত্রকে স্বেচ্ছাচারমূলক হইয়া উঠিতে বা তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের গণ্ডী অতিক্রম করিতে দেয় নাই, এবং যাহাতে উহা সমাজ-জীবনকে প্রাণহীন যন্ত্রবৎ করিয়া না তোলে সে বিষয়ে বাধা দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কেবল সুদীর্ঘ অবনতির যুগেই আমরা দেখিতে পাই যে, রাজকীয় প্রভুত্ব এবং জনসাধারণের স্ব-নিয়ন্ত্রণশীল কম্যুন্যাল জীবন এতদুভয়ের মধ্যস্থস্বরূপ যে-সব স্বাধীন অনুষ্ঠান ছিল সেগুলি হয় ক্রমশঃ লোপের দিকে অগ্রসর হইয়াছে অথবা তাহাদের পূর্ব্বতন শক্তি ও তেজস্বিতা অনেকখানি হারাইয়া ফেলিয়াছে, এবং আমলাতন্ত্রমূলক ব্যক্তিগত শাসনের ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অত্যধিক আধিপত্যের দোষগুলি একে একে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। যত দিন ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রাচীন রীতিনীতিগুলির স্মৃতি বজায় ছিল এবং যে-পরিমাণে সেগুলি সজীব ও কার্য্যকরী ছিল, তত দিন এই সব দোষ এখানে-সেখানে ক্ষণস্থায়ি-ভাবে দেখিতে পাওয়া যাইত, অথবা সেগুলি অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পরে যখন একদিকে

বিদেশীর আক্রমণ ও পরাধীনতা, অন্যদিকে ভারতের প্রাচীন কাল্‌চারের মন্থর অবনতি এবং শেষ পর্য্যন্ত পতন, এই দুইটি একসঙ্গে মিলিত হইল, তখনই প্রাচীন অনুষ্ঠানটি বহু অংশে ভাঙ্গিয়া পড়িল, দেশের সমাজ-রাষ্ট্রজীবন অধঃপতিত ও ছন্নছাড়া হইয়া গেল। পুনরভ্যুত্থান বা নূতন সৃষ্টির আর কোন যথেষ্ট উপায় বজায় রহিল না।

ভারতীয় সভ্যতার উচ্চতম বিকাশ ও গৌরবের দিনে আমরা দেখিতে পাই, এক অপূর্ব্ব রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি। তাহা ছিল উৎকৃষ্টরূপে কার্য্যক্ষম এবং তাহা কম্যুন্যাল স্বায়ত্তশাসনের সহিত দৃঢ়প্রতিষ্ঠতা ও সুশৃঙ্খলার পূর্ণ সমন্বয়সাধন করিয়াছিল। ষ্টেট্ নিজের শাসন, বিচার, অর্থনীতি ও দেশরক্ষাবিষয়ক কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু ঐ সকল বিভাগে জনসাধারণের এবং তাহাদিগকে লইয়া গঠিত অনুষ্ঠানসকলের অধিকার ও স্বাধীন কার্য্যে বিঘ্ন বা হস্তক্ষেপ করিত না। রাজধানীতে ও দেশের মধ্যে রাজকীয় আদালতগুলি ছিল শ্রেষ্ঠ বিচারালয়, সেগুলি সমস্ত রাজ্যের বিচার-কার্য্যের মধ্যে সঙ্গতিবিধান করিত; কিন্তু গ্রামসঙ্ঘ ও নগরসঙ্ঘগুলি নিজেদের আদালতে যে শাসনক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল, তাহার উপর রাজকীয় বিচারালয়-গুলি অযথাভাবে হস্তক্ষেপ করিত না। এমন কি,

রাজকীয় বিচারালয় গিল্ড্, জাতি ও পরিবারের নিজস্ব আদালতগুলির সহিত সহযোগিতা করিত, এগুলির দ্বারা প্রচুর পরিমাণে সালিশ নিষ্পত্তি হইত, এবং রাজকীয় আদালত কেবল বড় বড় অপরাধগুলিরই বিচারের ভার নিজেদের হস্তে রাখিতে চাহিত। যেমন বিচার-কার্য্য, তেমনই রাষ্ট্রকার্য্য নির্ব্বাহ ও অর্থনীতিক ক্ষমতার প্রয়োগে গ্রামসঙ্ঘ ও নগরসঙ্ঘগুলির অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। নগরে ও দেশে রাজার শাসনকর্ত্তা ও কর্ম্মচারিগণ জনসাধারণ ও তাহাদের সমিতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা, কর্ম্মচারী ও সাম্প্রদায়িক মুখ্যগণের পাশাপাশি থাকিয়াই কার্য্য করিত। ষ্টেট্ দেশবাসীর ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীনতায় অথবা প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবনপ্রণালীতে হস্তক্ষেপ করিত না; ষ্টেটের কাজ ছিল কেবল সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, এবং যাহাতে জাতীয় জীবনের সমস্ত কার্য্য জোরের সহিত নির্ব্বাহিত হয় সেই জন্য প্রয়োজনীয় পরিদর্শন করা, সাহায্য করা, সঙ্গতিবিধান করা, সকলরূপ সুবিধা ও সুযোগ করিয়া দেওয়া। ভারতের জাতীয় প্রতিভা যে স্থাপত্য, আর্ট, কাল্‌চার, শিক্ষা, সাহিত্য পূর্ব্বেই সৃষ্টি করিয়াছিল, সে-সবের উন্নতি করিতে উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা বিষয়ে ষ্টেটের যে পরম সুযোগ আছে, ষ্টেট তাহা খুবই বুঝিত এবং

সর্ব্বদা উদারতার সহিত সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত। রাজা ছিলেন এক স্বাধীন জীবন্ত জাতির মহান্ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার সম্মানার্হ ও শক্তিশালী মস্তকস্বরূপ, এবং রাজার শাসনপদ্ধতি ছিল উহার শ্রেষ্ঠ কার্য্য-নির্ব্বাহক অনুষ্ঠানস্বরূপ, তাহা স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র বা আমলাতন্ত্র ছিল না বা জাতীয় জীবনকে পেষণ করিবার যন্ত্র ছিল না।

ভারতীয় ঐক্যসাধন সমস্যা

পাশ্চাত্য সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন, ভারতীয় মনীষা যদিও বা দার্শনিকতা, ধর্ম্ম, আর্ট ও সাহিত্যে বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে, উহা জীবনসংগঠন ব্যাপারে অপটু ছিল, ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রয়োগে ন্যূন ছিল, উহার ইতিহাসে সুনিপুণ রাষ্ট্রনীতিক গঠন, গবেষণা ও কর্ম্মের স্থান শূন্য; কিন্তু প্রকৃত তথ্যসকল অবগত হইলে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ ও নীতি যথার্থ-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলে এইরূপ অভিযোগ একেবারেই দাঁড়াইতে পারে না। বরঞ্চ প্রকৃত সত্য এই যে, ভারতীয় সভ্যতা যে-চমৎকার রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ করিয়াছিল তাহার ছিল নিরেট গঠন ও স্থায়ী উৎকর্ষতা, রাষ্ট্রগঠন প্রচেষ্টায় মানুষের বুদ্ধি রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র ও অন্যান্য যে-সব আদর্শ ও নীতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ভারতীয় সভ্যতা অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত সে-সবের সমন্বয় সাধন করিয়াছিল, অথচ বর্ত্তমান য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের যে দোষ, সকল জিনিষকে যন্ত্রবৎ করিয়া তোলার দিকে অত্যধিক প্রবণতা, তাহা এড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল। ক্রমবিকাশ ও প্রগতির পাশ্চত্য আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে-সব আপত্তি

তোলা যাইতে পারে, পরে আমি সে-সমুদয় আলোচনা করিব।

কিন্তু রাষ্ট্রনীতির আর একটা দিক আছে যাহাতে একথা বলা যাইতে পারে যে, ভারতের রাষ্ট্রনীতিক মনীষা অকৃতকার্য্যতা ছাড়া আর কিছুই দেখাইতে সমর্থ হয় নাই। উহা যে-ব্যবস্থার বিকাশ করিয়াছিল তাহা দৃঢ়তায় ও শাসনবিষয়ক কার্য্যপটুতায় এবং প্রাচীন অবস্থানুযায়ী সমষ্টিজীবনের শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা বিধানে এবং জনসাধারণের কল্যানবিধানে প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু যদিই বা ভারতের অন্তর্গত বহু জনসমাজ প্রত্যেকে পৃথকভাবে স্বায়ত্বশাসনশীল ছিল, সুশাসিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্নছিল, এবং সমগ্র দেশে এক উচ্চবিকশিত সভ্যতা ও কৃষ্টি নিশ্চিতভাবে ক্রিয়া করিতে পারিত, তথাপি উক্ত ব্যবস্থা ভারতের জাতীয় ও রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যসাধন করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই, এবং শেষ পর্য্যন্ত বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে, জাতীয় অনুষ্ঠানগুলির ধ্বংস নিবারণ করিতে এবং বহুকালব্যাপী পরাধীনতা নিবারণ করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই। কোন সমাজের রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থার বিচার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই অবশ্য দেখিতে হয় যে, উহা জাতিকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধি, অভ্যন্তরীন স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা দিতে কতখানি সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু আবার ইহাও দেখিতে হয়

যে, অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে নিরাপদ থাকিবার কিরূপ ব্যবস্থা সে করিয়াছে; বহিঃশত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে আক্রমণ করিতে এবং তাহাদের আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে প্রয়োজনীয় ঐক্য ও শক্তি কতদূর বিকাশ করিয়াছে। ইহা যে দেখিতে হয় সেটা হয় ত মানবসমাজের পক্ষে নিছক প্রশংসার কথা নহে, যে-জাতি বা দেশ এরূপ রাষ্ট্রনীতিক শক্তিতে হীন, তাহার বিজেতাদের অপেক্ষা কৃষ্টি ও সভ্যতাতে সে অনেক উন্নত হইতে পারে, এবং কৃতী সমরকুশল রাষ্ট্র, আক্রমণশীল জাতি, পরদেশশোষণ-কারী সাম্রাজ্য অপেক্ষা মানবজাতির প্রগতিতে অনেক বেশীই সাহায্য করিয়া থাকিতে পারে, প্রাচীন গ্রীক ও মধ্যযুগের ইতালীয়নেরা তাহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু মানুষের জীবন এখনও প্রধানতঃ রহিয়াছে প্রাণশক্তির (vital) ক্ষেত্রে, এ-ক্ষেত্রে আত্ম-বিস্তার, ভোগদখল, আক্রমণ, পরস্পরকে গ্রাস করিবার এবং অপরের উপর আধিপত্য করিবার জন্য দ্বন্দ, এই সবের প্রেরণাই সমধিক বলবান, কারণ এই সবই হইতেছে প্রাণশক্তির প্রাথমিক ধর্ম্ম; অতএব যে সমষ্টিগত মনীষা ও চৈতন্য আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় সর্ব্বদা অসামর্থ্যের পরিচয় দেয়, এবং নিজের নিরাপদতার জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীভূত ও কার্য্যকরী ঐক্যের বিধান না করে, সে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রথমশ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য নহে সে

বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের জাতীয় ও রাষ্ট্র নীতিক ঐক্য কখনই সাধিত হয় নাই। ভারত প্রায় এক সহস্র বৎসর ধরিয়া বাহির হইতে বর্ব্বর জাতিদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছে, এবং প্রায় আর এক সহস্র বৎসর ক্রমান্বয়ে নানা বিদেশী শাসকের পদানত রহিয়াছে। অতএব বলিতেই হয় যে, ভারতবাসী রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে অক্ষম।

এখানেও প্রয়োজন হইতেছে সর্ব্বাগ্রে অত্যুক্তিসকলের খণ্ডন করা, প্রকৃত তথ্য এরং তাহাদের মর্ম্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা, এবং ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বস্তুতঃ যে সমস্যাটির সমাধান মিলে নাই তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। আর প্রথমতঃ যদি একটা জাতি ও সভ্যতার মহত্ত্ব বিচার করিতে হইলে তাহার সামরিক আক্রমণশীলতার হিসাব লইতে হয়, দেখিতে হয় কি পরিমাণে সে অপরের দেশ জয় করিয়া লইয়াছে, অপর জাতির সহিত সংগ্রামে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহার সুব্যবস্থিত পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি কতখানি জয়লাভ করিয়াছে, তাহার পরের দেশ শাসন ও শোষণ করিবার প্রেরণা কেমন অদম্য, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, জগতের মহাজাতিসকলের তালিকায় ভারতের স্থান বোধ হয় সর্ব্বনিম্নে। ভারত যে কখনও পরের দেশ আক্রমণ এবং নিজের সীমানার বাহিরে

রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না ; জগতের উপর আধিপত্য স্থাপনের কোনও মহাকাব্য বা সুদূর দিগ্বিজয় ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের কোনও মহান কাহিনী ভারতের কৃতিত্ব বর্ণনা করিতে রচিত হয় নাই। ভারত আত্মবিস্তার, দিগ্বিজয়, আক্রমণের যে একমাত্র মহৎ প্রয়াস করিয়াছে তাহা হইতেছে তাহার শিক্ষাদীক্ষার বিস্তার, বৌদ্ধধর্ম্মকর্ত্তৃক প্রাচ্য জগত আক্রমণ ও অধিকার, এবং তাহার আধ্যাত্মিকতা, আর্ট এবং চিন্তাশক্তির সঞ্চারণ। আর এই যে আক্রমণ, ইহাও ছিল শান্তিময়, ইহাতে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না। কারণ বলপ্রয়োগ ও দেশজয়ের দ্বারা অধ্যাত্ম সভ্যতা বিস্তারের যে নীতি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে গর্ব্ব করিবার বিষয় বা অজুহাত স্বরূপ তাহা ভারতের প্রচীন মনোভাব ও মতি-গতির এবং তাহার ধর্ম্মের মূল আদর্শের বিরোধী ছিল। সত্য বটে পর্য্যায়ক্রমে কতকগুলি ঔপনিবেশিক অভিযান ভারতের রক্ত এবং ভারতের শিক্ষাদীক্ষাকে দ্বীপপুঞ্জে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যে সকল জাহাজ ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূল হইতে যাত্রা করিয়াছিল সে-গুলি নিকটবর্ত্তী দেশসমূহকে জয় করিয়া ভারত-সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত রণতরী ছিল না, সেগুলিতে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ অথবা সাহসিক ভাগ্যান্বেষণকারিগণ ভারতের ধর্ম্ম, স্থাপত্য,

শিল্প, কাব্য, চিন্তা, জীবনধারা, আচারব্যবহার সঙ্গে করিয়া লইয়া এমন সব দেশে গিয়াছিল যেখানে তখনও সভ্যতার আলোক পৌঁছায় নাই। সাম্রাজ্য স্থাপনের, এমনকি জগৎব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা যে ভারতবাসীর মনে স্থান পায় নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের কাছে ভারতই ছিল জগৎ এবং তাহাদের সাম্রাজ্যচেষ্টার লক্ষ্য ছিল ভারতের অন্তর্গত জাতি-সমূহের মহান্ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

এই আদর্শ, এই প্রয়োজনের অনুভূতি, ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিয়ত প্রেরণা ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখিতে পাওয়া যায়—বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত যুগে, গুপ্ত ও মৌর্য্য সম্রাটগণের চেষ্টায়, মোগল ঐক্য সাধনে এবং শেষে পেশোয়াদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায়,—যতক্ষন না শেষ পর্য্যন্ত সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, এবং সকল বিবদমান শক্তি এক বিদেশী শাসনের অধীনতায় সমতা লাভ করিয়াছে, স্বাধীন জাতির স্বাধীন ঐক্যের পরিবর্ত্তে পরাধীনতার সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ঐক্যসাধনের এই যে মন্থর গতি, দুষ্করতা, অবস্থাবিপর্য্যয়, এবং সুদীর্ঘ প্রয়াসের শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পরিসমাপ্তি, ইহার কারণ কি ভারতীয় সভ্যতার, ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চেতনা ও সামর্থ্যের, কোনও মূলগত

অক্ষমতা, না, ইহার অন্য কোন কারণ আছে? ভারত-বাসী ঐক্যবদ্ধ হইতে অক্ষম, তাহাদের মধ্যে এক দেশপ্রেমের অভাব, তাহা কেবল বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেই সৃষ্ট হইতেছে, ধর্ম্ম ও জাতিভেদে তাহারা বহুধা বিভক্ত, এই সব লইয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। এই সব সমালোচনার গুরুত্ব যদি সম্পূর্ণ ভাবেই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়—এ গুলি সবই একেবারে সত্য নহে, বা ঠিক ভাবে কথিত হয় না, বা এ বিষয়ে যথার্থ প্রাসঙ্গিক নহে—তথাপি এ সব হইতেছে উপসর্গ মাত্র, ইহাদের গভীরতর কারণের সন্ধান আমাদিগকে করিতেই হইবে।

এইরূপ সমালোচনার সাধারণতঃ যে উত্তর দেওয়া হয় তাহা এই যে, ভারত একটা মহাদেশ বলিলেই হয়, বহু সংখ্যক জণসমাজকে লইয়া ইহা আয়তনে প্রায় য়ুরোপেরই সমান, য়ুরোপের ঐক্যসাধনে যে সব বাধা এখানকার বাধাও তেমনিই গুরুতর। য়ুরোপের ঐক্যসাধন এখনও কেবল আদর্শের স্তরে নিষ্ফল কল্পনামাত্র হইয়া রহিয়াছে, আজও তাহা কার্য্যতঃ সিদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই, ইহা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার অযোগ্যতার অথবা য়ুরোপীয়গণের রাষ্ট্রনীতিক অক্ষমতার পরিচায়ক না হয়, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাসে যে দেখিতে পাওয়া যায় ভারতবাসী ঐক্যের আদর্শটিকে

অনেক বেশী স্পষ্টতার সহিত গ্রহণ করিয়াছে, উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে অবিরত চেষ্টা করিয়াছে, এবং পুনঃ পুনঃ সফলতার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইহাকে অন্য মানদণ্ড লইয়া বিচার কর ঠিক হয় না। এরূপ যুক্তিতে কিছু জোর আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে, কারণ সাদৃশ্যটি মোটেই পূর্ণ নয়, এবং আনুষঙ্গিক অবস্থানিচয়ও ঠিক এক রকমের নহে। য়ুরোপের জাতিসকল তাহাদের সমষ্টিগত সত্তায় পরস্পর হইতে অতি সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত, এবং খৃষ্টধর্ম্মে তাহাদের যে আধ্যাত্মিক ঐক্য, এমন কি এক সাধারণ য়ুরোপীয় সভ্যতায় তাহাদের যে কৃষ্টিগত ঐক্য, তাহা ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিগত ঐক্যের ন্যায় কখনই এত বাস্তব ও সম্পূর্ণ ছিল না, আর তাহা তাহাদের জীবনের একেবারে কেন্দ্রস্বরূপ ছিল না, ইহার ভিত্তি বা সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান-ভূমি ছিল না, তাহা ছিল কেবল একটা সাধারণ আব্‌হাওয়া বা পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর মত। তাহাদের জীবনের ভিত্তি নিহিত ছিল রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক সংস্থানে, এবং ইহা প্রত্যেক দেশে বিশিষ্টভাবে পৃথক ছিল; আর পাশ্চাত্য মনে রাষ্ট্রনীতিক চেতনার যে প্রাবল্য তাহাই য়ুরোপকে বহু প্রতিদ্বন্দী ও সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত কলহে নিরত জাতিতে

বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে ঐক্যবৃদ্ধি, এবং বর্ত্তমানে অর্থনীতিক ব্যাপারে পরস্পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা, কেবল ইহাই শেষ পর্য্যন্ত. যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ঐক্য নহে, একটি League of Nations বা জাতিসঙ্ঘ, তাহাও এই সবেমাত্র গড়িয়া উঠিতেছে, এখনও বিশেষ কোন কাজের হয় নাই, তাহা যুগযুগান্তের দ্বন্দের ফলে যে মনোভাব সৃষ্ট হইয়াছে সেইটিকে য়ুরোপীয় জাতি-সকলের সাধারণ স্বার্থে নিয়োজিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভারতে অতি প্রাচীনকালেই আধ্যাত্মিকতা ও কৃষ্টিমূলক ঐক্য পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাহাই হইয়াছিল হিমালয় ও দুই সাগরের অন্তর্বর্ত্তী এই বিরাট জনসমূহের জীবনের মূল উপাদানস্বরূপ। প্রাচীন ভারতের লোকসকল কখনই রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক জীবনে পরস্পর হইতে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত পৃথক পৃথক জাতি ততটা ছিল না যতটা তাহারা ছিল এক মহান্ আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিসম্পন্ন জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতি ; সেই মহাজাতিটি ভৌগলিক সংস্থানে সমুদ্র ও পর্ব্বতমালার দ্বারা অন্যান্য দেশ হইতে যেমন সুদৃঢ়ভাবে পৃথক ছিল, তেমনিই তাহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও কৃষ্টির দ্বারা অন্যান্য জাতি হইতেও পৃথক ছিল। অতএব দশটি

যতই বিশাল হউক এবং কার্য্যতঃ যতই বাধা থাকুক তাহার রাষ্ট্রনীতিক ঐক্য য়ুরোপের ঐক্য অপেক্ষা সহজেই সম্পাদিত হওয়া উচিত ছিল। কেন তাহা হয় নাই সে কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে আরও গভীরে যাইতে হইবে ; তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সমস্যার সমাধানটিকে যে ভাবে অবধারণ করা হইয়াছিল বা করা উচিত ছিল বাস্তব চেষ্টা সে পথে চালিত হয় নাই এবং তাহা ভারতবাসীর বিশিষ্ট মনোভাবের বিরুদ্ধ হইয়াছিল।

ভারতীয় মনের সমগ্র ভিত্তিটি হইতেছে উহার আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্ম্মুখীনতার দিকে ঝোঁক, সকলের আগে এবং প্রধানতঃ আত্মা ও অন্তরের জিনিষের সন্ধান করা এবং আর সব কিছুকেই গৌণ বলিয়া, নিম্নতন জিনিষ বলিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ; এই সবকে মহত্তর জ্ঞানের আলোকে নির্ণয় করিতে হইবে, ব্যবহার করিতে হইবে, এই সব হইতেছে গভীরতর অধ্যাত্ম লক্ষ্যের একটা অভিব্যক্তি মাত্র, একটা প্রাথমিক ক্ষেত্র বা সহায়, অন্ততঃ একটা আনুষঙ্গিক কিছু। অতএব ভারতীয় মনের গতি হইতেছে—যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে হইবে প্রথমে সেটিকে অন্তরের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা, এবং পরে তাহার অন্যান্যদিকের বিকাশ করা। এই মনোভাব এবং ইহার ফলস্বরূপ ভিতর হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের দিকে সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি

থাকার দরুণ, ইহা অবশ্যম্ভাবীই ছিল যে, ভারত নিজের যে ঐক্য প্রথমে সৃষ্টি করিবে তাহা হইবে আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্য। রোমে অথবা প্রাচীন পারস্যদেশে বিজয়ী রাজ্য বা সমরতান্ত্রিক সংগঠনশীল জাতির প্রতিভা-কর্ত্তৃক কেন্দ্রানুগত বাহ্যিক শাসনের দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ভারতে প্রারম্ভেই সেরূপ ঐক্যসাধন সম্ভব হয় নাই। আমার মনে হয় না যে, এটা ভুল হইয়াছিল, এটা ভারতবাসীর ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাবের প্রমাণ, বা এক রাষ্ট্র প্রথমেই গঠন করা উচিত ছিল, পরে এক স্বাধীন ভারতীয় সাম্রাজ্যের সুবিশাল শরীরের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য নিশ্চিতভাবে বিকাশলাভ করিতে পারিত। প্রারম্ভেই যে-সমস্যাটি উঠিয়াছিল সেটি হইতেছে শতাধিক রাজ্য, কুল, জাতি (races), গোষ্ঠীর আবাস ভূমি এক অতি বিরাট দেশের সমস্যা, এ-বিষয়ে আর একটি গ্রীসেরই ন্যায়, কিন্তু বিশালভাবে বিস্তৃত গ্রীস্, আকারে প্রায় আধুনিক য়ুরোপেরই ন্যায় বৃহৎ। গ্রীসে যেমন মূলগত ঐক্যবোধের সৃষ্টি করিতে হেলেনিক্ (hellenic) কৃষ্টির ঐক্য প্রয়োজন হইয়াছিল, এখানেও এবং আরও অলঙ্ঘনীয়রূপে এই সকল লোকের মধ্যে একটা সচেতন আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্য প্রথম ও অপরিহার্য্য প্রয়োজন ছিল, ইহা ব্যতীত কোনও স্থায়ী ঐক্য সম্ভবপর ছিল না। এ বিষয়ে ভারতীয়

মনীষার, এবং ভারতের শিক্ষাদীক্ষার প্রতিষ্ঠাতা মহানুভব ঋষিগণের সহজোপলব্ধিতে কোন ভুলই হয় নাই। আর যদিই ধরিয়া লওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতের লোক-সকলের মধ্যে রোম্যান জগতের ন্যায় সামরিক ও রাষ্ট্র-নীতিক উপায়ের দ্বারা একটা বাহ্য সাম্রাজিক ঐক্য স্থাপন করা যাইত, তাহা হইলেও আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, ঐ রোম্যান্ ঐক্যও স্থায়ী হয় নাই, এমন কি রোমের জয় ও সংগঠনের দ্বারা প্রাচীন ইতালীর যে ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাও স্থায়ী হয় নাই; ভারতের বিশাল পরিধির মধ্যে পূর্ব্বেই আধ্যাত্মিকতা ও কৃষ্টির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা না করিয়া ঐরূপ ঐক্যসাধনের চেষ্টা করিলে তাহাও স্থায়ী হইত বলিয়া মনে হয় না। আর যদিই বা আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্যের দিকে একান্ত বা অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়া থাকে, এবং রাষ্ট্রনীতিক ও বাহ্য ঐক্যের চেষ্টা যৎসামান্যই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বলা চলে না যে, ইহার ফল কেবলই অনর্থকর হইয়াছিল বা ইহাতে কোনও সুবিধা হয় নাই। এই যে-মূল বৈশিষ্ট্য, এই অমোচনীয় আধ্যাত্মিকতার ছাপ, সকল ভেদবিভাগের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত ঐক্য, ইহারই ফলে ভারত যদিও এ-পর্য্যন্ত এক সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রনীতিক জাতিতে পরিণত হইতে পারে নাই, তথাপি টিকিয়া আছে এবং আজও ভারতই রহিয়াছে।

বস্তুতঃ কেবল আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্যই স্থায়ী ঐক্য। একটা জাতি টিকিয়া থাকে বেশীর ভাগ তাহার স্থিতিশীল মন ও আত্মার জন্য, তাহার স্থায়ী স্থূল শরীর ও বাহ্যিক সংগঠনের জন্য নহে। এই সত্যটি পাশ্চাত্যের বহির্মুখী মন বুঝিতে বা স্বীকার কবিতে অনিচ্ছুক হইতে পারে, কিন্তু যুগযুগান্তের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ লিখিত রহিয়াছে। ভারতের সমসাময়িক প্রাচীন জাতি সকল এবং তাহার পরে উদ্ভূত তাহা অপেক্ষা তরুণ অনেক জাতি লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, কেবল তাহাদের স্মৃতিচিহ্নগুলি পড়িয়া আছে। গ্রীস্ ও মিশর রহিয়াছে কেবল নামে ও মানচিত্রে, কারণ হেলাসের আত্মা (the soul of Hellas) অথবা যে জাতীয় আত্মা মেম্‌ফিস্ (Memphis) নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা আর আমরা এখন এথেন্স্ বা কাইরোতে দেখিতে পাইনা। রোম ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্ত্তী জাতিসকলের উপরে একটা রাষ্ট্রনীতিক এবং একটা শুধু বাহ্য কৃষ্টিমূলক ঐক্য চাপাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের জীবন্ত আধ্যাত্মিক, ও কৃষ্টিমূলক ঐক্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই। সেই জন্য পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, আফ্রিকা সাময়িক রোমান অধিকারের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়া দিল। এমন কি পশ্চিমের জাতিসকল, যাহাদিগকে এখনও লাতিন (Latin) জাতি বলা হয়, তাহারাও বর্ব্বরদের আক্রমণে

জীবন্তভাবে বাধা দিতে পারে নাই, বিজাতীয় জীবনীশক্তির সংমিশ্রণে নবজন্ম লাভ করিয়া তবেই তাহারা আধুনিক ইতালী, স্পেন ও ফ্রান্স হইতে পারিয়াছে। কিন্তু ভারত আজিও বাঁচিয়া আছে, এবং অভ্যন্তরীন মন, প্রাণ, আত্মায় যুগযুগান্তের ভারতের সহিত যোগসূত্র বজায় রাখিয়াছে। বিদেশীর আক্রমণ ও শাসন, গ্রীক্, পার্থিয়ান, হুণ, ইস্‌লামের দুর্দ্ধর্ষ তেজ, ব্রিটিশ শাসন ও ব্রিটিশ তন্ত্রের সর্ব্বপেষণকারী ষ্টীম্-রোলার সদৃশ গুরুভার, পাশ্চাত্যের ভীষণ চাপ, কিছুই বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ভারতের দেহ হইতে তাহার প্রাচীন আত্মাকে বহিষ্কৃত করিতে বা ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রতি পদে, প্রত্যেক বিপদ, আক্রমণ ও পরাধীনতার মধ্যে সে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার গৌরবের যুগে সে ইহা করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহার আধ্যাত্মিক সংহতির বলে এবং সাঙ্গীকরণ ও প্রতিক্রিয়া করিবার শক্তির বলে, যাহা গ্রহণসাধ্য নহে সে সমুদয়কে দূর করিয়া দিয়াছে, যাহা দূর করা যায় না সে সমুদকে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে, এমন কি যখন তাহার অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে তাহার পরেও ঐ শক্তির বলেই সে বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে, নিস্তেজ হইলেও অবধ্য থাকিয়া গিয়াছে, পিছু হটিয়া দক্ষিণদেশে কিছুকাল তাহার প্রাচীন

রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বজায় রাখিয়াছে। ইস্‌লামের আক্রমণ হইতে তাহার প্রাচীন আত্মা ও আদর্শকে রক্ষা করিতে রাজপুত, শিখ ও মারাঠার অভ্যুত্থান করিয়াছে, যেখানে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই যেখানে নিষ্ক্রিয়ভাবেই আত্মরক্ষা করিয়াছে, যে সাম্রাজ্য তাহার সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই বা তাহার সহিত সন্ধি করিতে পারে নাই তাহাকেই সে ধ্বংসের মুখে পাঠাইয়াছে, এবং সর্ব্বদা নিজের পুনরভ্যুত্থানের সুদিন অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। আর এখনও এইরূপই একটি ব্যাপার আমাদের চক্ষের সম্মুখে ঘটিতেছে দেখিতে পাইতেছি। তাহা হইলে যে সভ্যতা এই অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার অসাধারণ জীবনী শক্তি সম্বন্ধে, এবং যাঁহারা ইহার ভিত্তি কোন বাহ্য জিনিষের উপর স্থাপন না করিয়া আত্মা ও অভ্যন্তরীণ মনের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্যকে তাহার ক্ষণভঙ্গুর শোভামাত্র না করিয়া তাহার জীবণের মূল ও সারবস্তু করিয়া দিয়াছিলেন, ধ্বংসশীল ঊর্দ্ধস্তরমাত্র না করিয়া চিরস্থায়ী ভিত্তি করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের দূরদৃষ্টি ও জ্ঞান সম্বন্ধে আর বলিবার কি আছে ?

কিন্তু আধ্যাত্মিক ঐক্য, ব্যাপক ও নমনীয় জিনিষ, রাষ্ট্রনীতিক ও বাহ্যিক ঐক্যের ন্যায় ইহা কেন্দ্রীকরণ

ও সমরূপতার উপর নির্ভর করে না, বরঞ্চ ইহা সর্ব্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এবং জীবনের বহু বৈচিত্র্য ও স্বাধীনতার অবাধ অবসর দেয়। প্রাচীন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার সমস্যা কেন এত কঠিন ছিল, এইখানেই আমরা সেই গূঢ় কারণের আভাস পাই। সাধারণতঃ যেভাবে ইহা সম্পন্ন করা হয়, এক কেন্দ্রানুগত সমাকার সাম্রাজিক ষ্টেটের দ্বারা সকল স্বচ্ছন্দ বৈচিত্র্য, স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য, প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা লুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়, ভারতে তাহা সম্ভব হয় নাই, এবং যতবারই এইরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে, ততবারই তাহা দীর্ঘকাল কৃতকার্য্যতার আভাস দিলেও শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে; এমন কি আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, ভারতের ভাগ্যদেবতাগণ যে ঐরূপ চেষ্টাকে ব্যর্থ হইতে বাধ্য করিয়াছেন, যেন তাহার আভ্যন্তরীণ সত্তার বিনাশ না হয়, যেন সাময়িক নিরাপদতার ব্যবস্থা করিতে গিয়া তাহার আত্মা জীবনের গভীর উৎসগুলিকে নষ্ট করিয়া না ফেলে, এটা ঠিকই করা হইয়াছে। ভারতের পক্ষে প্রকৃত প্রয়োজন কি তাহা ভারতের প্রাচীন মনীষা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল; তাহার সাম্রাজ্যের আদর্শ ছিল এমন এক ঐক্যসাধক শাসনতন্ত্র যাহা স্থানীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা যেখানে যাহা আছে সব বজায় রাখিবে,

কোন জীবন্ত স্বায়ত্ত্বশাসনমূলক অনুষ্ঠানকে বৃথা নষ্ট করিবে না, জীবনের সমন্বয় সাধন করিবে, যান্ত্রিক ঐক্য নহে। যে অবস্থাপরম্পরার মধ্যে এরূপ সমাধান নিশ্চিতভাবে বিকশিত হইতে পারিত, পরবর্ত্তীকালে সে সমুদয়ের অভাব হয়, এবং তাহার পরিবর্ত্তে শাসনমূলক একচ্ছত্র সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রয়াস করা হয়। এক আসন্ন ও বাহ্য প্রয়োজন মিটাইতে এইরূপ চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মহত্ত্ব ও চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারে নাই। পারে নাই, কারণ উহা যে পথ ধরিয়াছিল ঘটনাক্রমে তাহা ভারতীয় আত্মার প্রকৃত গতির অনুযায়ী হয় নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতীয় রাষ্ট্র-সমাজ ব্যবস্থার মূলগত নীতি ছিল কম্যুনাল বা সাম্প্রদায়িক স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠান সকলের সমন্বয় সাধন, গ্রামের স্বা-তন্ত্র্য, নগর ও রাজধানীর স্বা-তন্ত্র্য, জাতির (caste) স্বা-তন্ত্র্য, গিল্ড, গোষ্ঠী, কুল, ধর্ম্মসঙ্ঘ প্রভৃতির স্বা-তন্ত্র্য, এই সবের সমন্বয় সাধন। ষ্টেট্ বা রাজতন্ত্র বা গণসঙ্ঘ ছিল এই সকল স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখিবার এবং এক মুক্ত ও জীবন্ত রাষ্ট্রশরীরের মধ্যে লইয়া সকলকে সমঞ্জসীভূত করিবার যন্ত্র। সাম্রাজিক সমস্যা ছিল আবার এই সকল ষ্টেট্ জাতি, নেশন্‌কে তাহাদের স্বা-তন্ত্র্য বজায় রাখিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং এইভাবে এক বৃহত্তর মুক্ত ও

জীবন্ত রাষ্ট্রশরীরের মধ্যে সকলের ঐক্য সাধন করা। এমন এক রাষ্ট্রসংগঠন আবিষ্কার করা প্রয়োজন ছিল যাহা তাহার সকল অঙ্গের শান্তি ও ঐক্য রক্ষা করিবে, বাহ্য আক্রমণ হইতে নিরাপদতার সুব্যবস্থা করিবে, বা ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির আত্মা ও শরীরের স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া ও ক্রমবিকাশকে ঐক্যে ও বৈচিত্র্যে, অঙ্গীভূত সকল সাম্প্রদায়িক ও স্থানীয় অনুষ্ঠানের অপ্রতিহত ও কর্ম্মময় জীবনে, সম্পূর্ণতা প্রদান করিবে, **ধর্ম্মকে** বিরাট ও সমগ্র আয়তনে কার্য্য করিতে দিবে।

ভারতের প্রাচীন মণীষা সমস্যাটিকে এই অর্থেই বুঝিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালের শাসনমূলক সাম্রাজ্য ইহাকে কেবল আংশিকভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার ঝোঁক ছিল খুব ধীরে ধীরে এবং প্রায় অজ্ঞাতসারেই অধীনস্থ স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা না হউক, অন্ততঃ তাহাদের শক্তিকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া দেওয়া,—সকল কেন্দ্রীকরণের চেষ্টাতেই এইরূপ ঝোঁক অবশ্যাম্ভাবী। ইহার পরিণাম হইয়াছিল এই যে, যখনই কেন্দ্রীর শক্তিটি দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, তখনই ভারতের জাতীয় জীবনের মূলতঃ প্রয়োজনীয় প্রাদেশিক স্বা-তন্ত্র্যের চিরন্তণ নীতি পুনরায় মাথা তুলিয়া উঠিয়া কৃত্রিমভাবে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দিত; কিন্তু তাহার দ্বারা যাহা হওয়া উচিত ছিল, সমগ্র জাতীর জীবনের গভীর সামঞ্জস্যসাধনে এবং

অধিকতর মুক্ত অথচ ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়ায় সহায় হওয়া, তাহা আর হইয়া উঠিত না। সাম্রাজিক রাজতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় সভাগুলিরও শক্তি হ্রাস করিয়া দিয়াছিল, এবং তাহার ফলে মূল সাম্প্রদায়িক স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠানগুলি এক ঐক্যবদ্ধ শক্তির অঙ্গ না হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভেদেরই সৃষ্টি করিয়াছিল। পল্লী সমাজ (Village Community) নিজের সজীব শক্তি কতকটা বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু ঊর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাহার কোন জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল না, এবং বৃহত্তর জাতীয়তা বোধ হারাইয়া যে-কোন দেশী বা বিদেশী শাসন তাহার নিজের স্ব-পর্য্যাপ্ত সঙ্কীর্ণ জীবনকে সম্মান করিত তাহাকেই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল। ধর্ম্মসঙ্ঘগুলির মধ্যেও এই রূপ ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। জাতিভেদ কোনও প্রকৃত প্রয়োজন ব্যতীত অথবা দেশের আধ্যাত্মিক বা অর্থনীতিক প্রয়োজনের সহিত কোনও সম্বন্ধ ব্যতীত সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিয়া কেবল অলঙ্ঘ্য আচারমূলক বিভাগে পরিণত হইল, এইভাবে সে-গুলি দেশের মধ্যে কেবল ভেদ বিরোধেরই সৃষ্টি করিল, পূর্ব্বের ন্যায় আর সমগ্র জাতীয় জীবনের সুসমঞ্জস ক্রিয়ার অঙ্গ স্বরূপ রহিল না। ইহা সত্য নহে যে, প্রাচীন ভারতে জাতিবিভাগ দেশের মিলিত জীবনের পরিপন্থী ছিল, কিম্বা পরবর্ত্তীকালেও তাহা সাক্ষাৎভাবে রাজনীতিক দ্বন্দ্ব বা অনৈক্যের সৃষ্টি করিত (যদিও শেষ-

কালে, চরম অধঃপতনের যুগে, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র সংগঠনের শেষভাগে এইরূপই ঘটিয়াছিল), কিন্তু বাস্তবিকই তাহা সমাজে ভেদবৈষম্য সৃষ্টি করিবার এবং মুক্ত ও জীবন্তভাবে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের পরিপন্থী অচলায়তন বিভাগ সৃষ্টি করিবার গৌণ শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্যবস্থাটির আনুসঙ্গিক দোষগুলি মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষভাবে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু সূত্রপাত-রূপে সেগুলি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, এবং পাঠান ও মোগল সাম্রাজ্যের দ্বারা যে অবস্থানিচয়ের সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে সে-গুলি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই-সব উত্তরকালীন সাম্রাজিক অনুষ্ঠান যতই জাঁকজমকপূর্ণ ও শক্তিশালী হউক তাহাদের স্বরূপ স্বৈরাচারমূলক (autocratic) ছিল বলিয়া তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী সাম্রাজ্য সকল অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে কেন্দ্রানুবর্ত্তিতার দোষ-গুলি পাইয়াছিল, এবং কৃত্রিম ঐক্যসাধন ব্যবস্থার প্রতি ভারতের প্রাদেশিক জীবনের সেই একই বিরোধিতার ফলে সেগুলি পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অথচ জাতির জীবনের সহিত তাহাদের কোনও সত্য, জীবন্ত যোগ না থাকায় তাহারা এমন সাধারণ দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিতে পারে নাই যাহা তাহাদিগকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। অবশেষে আসিয়াছে এক যন্ত্রবৎ পাশ্চাত্য শাসন, তাহা অবশিষ্ট সাম্প্রদায়িক ও

স্থানীয় স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠানগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে যন্ত্রবৎ প্রাণহীন ঐক্য স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু আবার ইহারও বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় আমরা দেখিতে পাইতেছি সেই প্রাচীন নীতিসকল পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে,—ভারতবাসীর স্থানীয় স্ব-তন্ত্র জীবন পুনর্গঠনের দিকে প্রবণতা, জাতি, ও ভাষার সত্য বিভাগ অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি, রাষ্ট্রশরীরের স্বাভাবিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন্ত অনুষ্ঠানরূপে অধুনালুপ্ত পল্লী-সমাজের আদর্শের দিকে ভারতীর মনের পুনরার দৃষ্টি ; এবং এখনও পুনরুজ্জীবিত না হইলেও, অপেক্ষাকৃত উন্নতব্যক্তিগণের মনে আভাসরূপে দেখা দিতে আরম্ভ করিতেছে, ভারতীয় জীবনের উপযোগী কম্যুনাল ভিত্তির, এবং আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠার উপর ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রকে নবীভূত ও পুনর্গঠিত করিবার আরও সত্য আদর্শ।

অতএব ভারতীয় ঐক্যসাধনের চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছিল, এবং তাহার পরিণাম হইয়াছিল বিদেশীর আক্রমণ এবং শেষ পর্য্যন্ত পরাধীনতা, তাহার কারণ কাজটির বিশালতাও বটে আবার উহার বিশিষ্ট স্বরূপও বটে, কারণ কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের সহজ পন্থা ভারতে প্রকৃতপক্ষে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব ছিল না, অথচ মনে হইয়াছিল যে এইটিই বুঝি একমাত্র পন্থা, এবং পুনঃ পুনঃ এই দিকেই চেষ্টা করা হইয়াছিল ; সে চেষ্টার আংশিক সফলতা

সাময়িকভাবে এবং বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে সমর্থন করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা কখনই কৃতকার্য্য হয় নাই। আমি বলিয়াছি যে, ভারতের প্রাচীন মনীষা সমস্যাটির মূলস্বরূপ আরও ভালভাবে বুঝিয়াছিল। বৈদিক ঋষি ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ ভারতীয় জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি স্থাপন করা এবং ভারতের অন্তর্গত বহু জাতি (Races) ও জনসমাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক ঐক্যস্থাপন করাকেই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজন সম্বন্ধেও অন্ধ ছিলেন না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, আর্য্যগণের কুলপ্রথামূলক জীবনের নিরন্তর প্রবৃত্তি হইতেছে, বিভিন্ন আকারের কুল, বংশ, রাজ্য পরস্পরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে, এবং সকলে মিলিয়া কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইবে, এই ভাবে বৈরাজ্য ও সাম্রাজ্যের অধীনে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইবে; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই প্রবৃত্তির পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়াই ঠিক পন্থা, এবং সেইজন্য তাঁহারা চক্রবর্ত্তীর আদর্শ বিকাশ করিয়াছিলেন—এক ঐক্যসাধক সাম্রাজিক শাসন আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতের অন্তর্গত বহু রাজ্য ও জাতিগুলিকে (Races) তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়া ঐক্যবদ্ধ করিবে। এই আদর্শটিকে তাঁহারা ভারতীয় জীবনের অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায়ই ধর্ম্ম ও

আধ্যাত্মিকতার দ্বারা সমর্থন করিয়াছিলেন, এবং এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করা শক্তিশালী নরপতির পক্ষে ধর্ম্ম বলিয়া, রাজকীয় ও আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন। সে ধর্ম্ম তাহাকে তাহার অধীনতায় আগত জনসমূহের স্বাধীনতা নষ্ট করিতে দিত না, তাহাদের রাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত বা ধ্বংস করিতে অথবা তাহাদের কর্ম্মচারিগণের পরিবর্ত্তে নিজের কর্ম্মচারী ও প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে দিত না। তাহার কাজ ছিল এমন এক ঊর্দ্ধতন আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করা যাহা সামরিক শক্তিতে দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দেশের সমস্ত শক্তিকে একত্র করিতে পারিবে। আর এই প্রাথমিক কর্ত্তব্যের সহিত আর এক আদর্শ যুক্ত হইয়াছিল,—এক প্রবল ঐক্যসাধক শক্তির অধীনে ভারতীয় ধর্ম্মের, ভারতের আধ্যাত্মিক, ধার্ম্মিক, নৈতিক ও সামাজিক কৃষ্টির যথাযথ ক্রিয়ার সংরক্ষণ ও পূর্ণবিকাশ।

এই আদর্শের পূর্ণরূপটি আমরা দেখিতে পাই রামায়ণ ও মহাভারতে। মহাভারতে এইরূপই একটি সাম্রাজ্যস্থাপন চেষ্টার, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন চেষ্টার কাল্পনিক, অথবা হইতে পারে, ঐতিহাসিক কাহিনী। সেখানে আদর্শটিকে এমনই অবশ্যপালনীয় ও বহুজন-স্বীকৃত বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে যে, শিশুপালের ন্যায় দুরন্ত রাজাও বশ্যতা স্বীকার-

পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করিয়াছিল এই বলিয়া যে, যুধিষ্ঠির যাহা করিতেছেন তাহা ধর্ম্মেরই অনুশাসন। আর রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই এইরূপই ধর্ম্মরাজ্যের, এক সুপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বব্যাপী সাম্রাজ্যের আদর্শ চিত্র। এখানেও সেটি স্বেচ্ছাচারী স্বৈরশাসন নহে, পরন্তু রাজধানীর, প্রদেশ সমূহের এবং সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি-স্বরূপ স্বাধীন জনসভা দ্বারা সমর্থিত সার্ব্বভৌম রাজতন্ত্র; তাহা ভারতীয় ব্যবস্থানুযায়ী সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান-গুলির সমন্বয়সাধক এবং ধর্ম্মের নীতি ও বিধানরক্ষক রাজতন্ত্র ষ্টেটেরই পরিবর্দ্ধিত রূপ। যে বিজয়ের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বিজিত জনসমূহের জীবন্ত স্বাধীনতা হরণকারী, তাহাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সকলের বিলোপসাধনকারী এবং তাহাদের অর্থনীতিক সম্পদ শোষণকারী ধ্বংসপরায়ণ লুণ্ঠনাত্মক আক্রমণ নহে; পরন্তু তাহা এক যজ্ঞীয় যাত্রা (sacrificial progression), তাহাতে যে শক্তি-পরীক্ষা হইত তাহার ফলাফল সকলে সহজেই মানিয়া লইত, কারণ পরাজয়ের ফলে অবমাননা, দাসত্ব বা উৎপীড়নের সম্ভাবনা ছিল না; কেবল যে বিজয়ী শক্তির একমাত্র লক্ষ্য জাতির ও ধর্ম্মের প্রকাশ্য ঐক্য সাধন তাহার প্রতি আনুগত্যই দূরীভূত হইত। প্রাচীন ঋষিগণের আদর্শ এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট; বুঝা যায় যে, দেশের বিচ্ছিন্ন ও কলহনিরত জনসমূহকে ঐক্যবদ্ধ

করার সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিক প্রয়োজন তাঁহারা দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আবার ইহাও দেখিয়াছিলেন যে, প্রদেশ সকলের স্ব-তন্ত্র জীবন বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করিয়া ঐ ঐক্যসাধন উচিত নহে, অতএব কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র অথবা কড়াকড়িভাবে ঐক্যমূলক সাম্রাজিক ষ্টেটের দ্বারা উচিত নহে। তাঁহারা দেশবাসীর মনে যে-আদর্শ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য দেশে তাহার নিকটতম সাদৃশ্য হইতেছে এক সাম্রাজিক আধিপত্যের অধীনে বিভিন্ন স্ব-তন্ত্র জাতি ও রাজ্যের সম্মেলন, "a hegemony or confederacy under an imperial head."

এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করা যে কখনও সম্ভব হইয়াছিল তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, যদিও পৌরাণিক কিম্বদন্তী এই যে, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যের পূর্ব্বেও এইরূপ রাজ্য কয়েকবারই স্থাপিত হইয়াছিল। বুদ্ধের সময়ে এবং পরে চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য যখন ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য গঠন করিতেছিলেন, তখনও দেশ স্বাধীন রাজ্য ও গণতন্ত্রে পূর্ণ ছিল, এবং আলেক্-জান্দারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মত কোন ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য বর্ত্তমান ছিল না। পূর্ব্বে যদিই বা কখনও চক্রবর্ত্তীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাকে স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা বা প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা বুঝা যায়। যদি সময়

দেওয়া হইত তাহা হইলে হয়ত তাহার বিকাশ হইতে পারিত, কিন্তু ইতিমধ্যে এক গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাতে অবিলম্বে একটা সমাধান করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্ব্বলতা হইতেছে তাহার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদ্বার-সকলের ভেদ্যতা, আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এইরূপই ছিল। যতদিন প্রাচীন ভারত সিন্ধুনদকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং শক্তিশালী গান্ধার ও বহ্লিক রাজ্যদ্বয় বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে অজেয় দুর্গস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল, ততদিন ঐ দুর্ব্বলতার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ পারস্যসাম্রাজ্যের আক্রমণে তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং তখন হইতে বরাবর সিন্ধুনদের পরপারে অবস্থিত দেশসকল আর ভারতের অন্তর্গত থাকে না, এবং সেই জন্যই তাহারা আর ভারতের রক্ষক স্বরূপ না হইয়া বরং ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক আক্রমণকারীর নিরাপদে দাঁড়াইবার স্থানে পরিণত হয়। আলেকজান্দারের আক্রমণ ভারতের রাষ্ট্রনীতিক মনকে বিপদটির গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ করিয়া দিল, এবং সেই সময় হইতেই আমরা দেখিতে পাই, কবি, লেখক, রাষ্ট্রনীতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সাম্রাজ্যের আদর্শ সর্ব্বদা প্রচার করিয়াছেন, অথবা কি উপায়ে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা

যাইতে পারে সে-বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। কার্য্যতঃ ইহার অব্যবহিত ফল হইল চাণক্যের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা দ্বারা আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত গঠিত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়; মাঝে মাঝে দুর্ব্বলতা এবং অন্তর্নিহিত ধ্বংসের বীজ সত্ত্বেও সেই সাম্রাজ্য আট নয় শত বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে মৌর্য্য, সুঙ্গ, কানোয়া, অন্ধ্র ও গুপ্তবংশের দ্বারা রক্ষিত বা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সাম্রাজ্য, ইহার চমৎকার সংগঠন, কার্য্য-নির্ব্বাহক পদ্ধতি, জনহিতকর অনুষ্ঠান, সমৃদ্ধি, আশ্চর্য্য কৃষ্টি এবং ইহার আশ্রয়াধীন দেশবাসীর তেজবিক্রম, শ্রী, ও অপূর্ব্ব সৃষ্টিশক্তিপূর্ণ জীবনের ইতিহাস কেবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ নিদর্শন সকল হইতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে পৃথিবীর মহান্ জাতিসকলের প্রতিভা দ্বারা গঠিত ও সংরক্ষিত মহত্তম সাম্রাজ্য সকলের মধ্যেই স্থান দেওয়া যায়। সাম্রাজ্যগঠনে প্রাচীন কালে ভারত যাহা করিয়াছে তাহাতে এই দিক দিয়া তাহার গর্ব্ব না করিবার কোন কারণ নাই, অথবা যাহারা অজ্ঞতার বশে হঠাৎ মত প্রকাশ করিয়া বসে যে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় সমর্থ ব্যবহারিক প্রতিভা বা উচ্চ রাষ্ট্রনীতিক দক্ষতা ছিল না, তাহাদের কথাও মাথা পাতিয়া লইবার কোনও প্রয়োজন নাই।

তবে ইহাও ঠিক যে, একটি আসন্ন প্রয়োজন মিটাইতে এই সাম্রাজ্যটির প্রাথমিক গঠনে যে ব্যস্ততা, জোরজবরদস্তি ও কৃত্রিমতা অবলম্বন করা অপরিহার্য্য হইয়াছিল, তাহার ফলও তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল, কারণ সেজন্য সেটি প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অনুসারে সুদৃঢ়ভাবে ভারতের গভীরতম আদর্শের সুচিন্তিত, স্বাভাবিক ও সুনিয়ন্ত্রিত বিকাশ হইতে পারে নাই। এক কেন্দ্রগত সাম্রাজিক রাজতন্ত্র স্থাপন চেষ্টার পরিণাম হইয়াছিল এই যে, স্থানীয় স্ব-তন্ত্র অনুষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের জীবন্ত সমন্বয় সাধিত হয় নাই। যদিও ভারতীয় নীতি অনুসারে তাহাদের আচার ও অনুষ্ঠান সকলকে সম্মান করা হইত, এবং প্রথম প্রথম তাহাদের রাষ্ট্রনীতিক অনুষ্ঠানগুলিকেও, অন্ততঃ অনেক ক্ষেত্রেই, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় নাই, পরন্তু সাম্রাজিক ব্যবস্থারই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তথাপি সেগুলি সাম্রাজিক কেন্দ্রানুগতার ছায়ায় বস্তুতঃপক্ষে সজীব ও সতেজ থাকিতে পারে নাই। প্রাচীন ভারতের স্বাধীন জাতি সকল অদৃশ্য হইতে লাগিল, তাহাদের ভগ্নাবশেষ হইতেই পরে বর্ত্তমান ভারতীয় জাতি সকলের (Indian races) উদ্ভব হয়। আর আমার মনে হয় মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, যদিও প্রধান জাতীয় সভাগুলি বহুকাল পর্য্যন্ত সতেজ ছিল, শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের ক্রিয়া

অনেকটা যন্ত্রবৎ কৃত্রিম হইয়া পড়ে এবং তাহাদের জীবনী-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত ও ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ করে। নাগরিক রিপাবলিক্‌গুলিও ক্রমশঃ সংহত রাজ্য বা সাম্রাজ্যের কেবল মিউনিসিপালিটিতে পরিণত হয়। সাম্রাজিক কেন্দ্রীকরণ এবং পূর্ব্বকালীন উচ্চতর স্বাধীন জাতীয় সভাগুলি দুর্ব্বল ও লুপ্ত হওয়ার ফলে যে মনোভাব ও সংস্কারের উদ্ভব হয়, তাহাতে একটা আধ্যাত্মিক ব্যবধানের মত সৃষ্টি হইল,—এদিকে প্রজাবর্গ যে-কোন গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিরাপদতার ব্যবস্থা করিত এবং তাহাদের ধর্ম্ম, জীবন, আচার ব্যবহারের উপর অত্যধিক হস্তক্ষেপ না করিত তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে লাগিল, আর অন্যদিকে রহিল সাম্রাজিক শাসন, তাহা হিতকারী ও গৌরবান্বিত ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতের প্রাচীন ও সত্য রাষ্ট্রনীতিক মণীষা স্বাধীন ও প্রাণময় জাতি সকলের মস্তকস্বরূপ যে-জীবন্ত অনুষ্ঠানের কল্পনা করিয়াছিল তাহার আর অস্তিত্ব রহিল না। এই সকল পরিণাম সুস্পষ্ট হয় এবং চরমে উঠে অবনতির সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু বীজরূপে তাহারা সকল সময়েই বর্ত্তমান ছিল, এবং ঐক্যসাধনের জন্য যান্ত্রিক প্রণালী অবলম্বন করায় সেগুলি একরকম অবশ্যম্ভাবীই হইয়া পড়িয়াছিল। সুবিধার মধ্যে হইয়াছিল অধিকতর শক্তিমান ও ও সংহত সামরিক উদ্যোগ, এবং অধিকতর নিয়মিত ও সমভাবাপন্ন শাসনক্রিয়া, কিন্তু

যে স্বাধীন প্রাণময় বৈচিত্রপূর্ণ জীবনে জাতির মন ও প্রকৃতির সত্য প্রকাশ, তাহা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এই সবের দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত সে ক্ষতির আর পূরণ হয় নাই।

আরও অশুভ এক পরিণাম হইয়াছিল ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ হইতে পতন। রাজ্যের সহিত রাজ্য প্রভুত্বের জন্য দ্বন্দে প্রবৃত্ত থাকায়, কূটরাজনীতির (Machiavellian Staecraft) অভ্যাস পূর্ব্বেকার মহত্তর নৈতিক আদর্শ সকলের স্থান গ্রহণ করিল, দুরন্ত বিজয়াকাঙ্খাকে দমন করিবার মত কোন আধ্যাত্মিক বা নৈতিক প্রতিবন্ধক রহিল না, এবং রাজনীতি ও শাসননীতিতে জাতির মন অনেকটা রুঢ় ও নীচ হইয়া পড়িল; মৌর্য্য-যুগের কঠোর দণ্ডবিধি আইনে এবং অশোক কর্ত্তৃক উড়িষ্যাবিজয়ে নৃশংস রক্তপাতে ইতিমধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই অবনতির গতি ধর্ম্মভাব ও উচ্চ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিরুদ্ধ থাকায় আরও প্রায় এক সহস্র বৎসরকাল চরম অবস্থার পৌঁছিতে পারে নাই; ইহার পূর্ণ বেগটি আমরা দেখিতে পাই কেবল চূড়ান্ত অধঃপতনের যুগে, তখন পরস্পরকে অবাধ আক্রমণ, রাজা ও নেতাগণের উচ্ছৃঙ্খল অহমিকা, রাষ্ট্রনীতিক বুদ্ধির এবং কার্য্যকরীভাবে ঐক্যবদ্ধ হইবার শক্তির একান্ত অভাব, এক সাধারণ দেশপ্রেমের অভাব, এবং কোন রাজা গিয়া কে রাজা হইল সে-বিষয়ে জনসাধারণের চির-উদাসীনতা, এই

সমগ্র বিরাট দেশকে সমুদ্র পার হইতে আগত মুষ্টিমেয় বণিকের হস্তে তুলিয়া দিল। কিন্তু চরম উপসর্গগুলি যতই মন্থরগতিতে আসিয়া থাকুক, এবং প্রথম প্রথম সাম্রাজ্যটির রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্ব, দেশের সভ্যতায় অপূর্ব্ব শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্পসম্পদ এবং পুনঃ পুনঃ আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান, সেই সমুদয়কে যতই সংশোধিত ও নিবারিত করিয়া থাকুক, শেষ গুপ্ত রাজাগণের সময়ের মধ্যেই ভারত তাহার অধিবাসিবৃন্দের রাষ্ট্রনীতিক জীবনে তাহার সত্য মন ও অন্তরতম আত্মার স্বাভাবিক ও পূর্ণবিকাশ করিবার সম্ভাবনা হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

তবে যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য সাম্রাজ্যটি সৃষ্ট হইয়াছিল, ইতিমধ্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে না হইলেও যথেষ্ট ভাবেই সিদ্ধ করিতে সে সমর্থ হইয়াছিল। সে প্রয়োজন ছিল ভারতের মাটি ও ভারতীয় সভ্যতাকে বর্ব্বর জাতি-গণের সেই বিরাট প্লাবনতুল্য উপদ্রব হইতে রক্ষা করা যাহা সকল প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতারই পরম বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং যাহার বিরুদ্ধে উচ্চ-বিকশিত গ্রীকো-রোমান সভ্যতা এবং বিশাল ও শক্তিশালী রোমক সাম্রাজ্যও শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই। সেই উপদ্রব টিউটন্, স্লাভ্, হূন ও শকগণের বিপুল বাহিনী সকল পশ্চিমে, পূর্ব্বে, দক্ষিণে ছড়াইয়া দিয়াছিল, বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের দ্বারে পুনঃ

পুনঃ দারুণ আঘাত করিয়াছিল, কখনও কখনও ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু যখন তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহা ভারতীর সভ্যতার মহান্ সৌধকে দণ্ডায়মানই রাখিয়া গেল, তাহা তখনও রহিল সুদৃঢ়, মহান্ ও নিরাপদ। ভারতে তাহারা প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত যখনই সাম্রাজ্যটি দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, এবং মনে হয় দেশ কিছুদিন ধরিয়া নিরাপদ থাকিলেই ইহা ঘটিত। যে প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সাম্রাজ্যটির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অভাব হইলেই সেটি দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, কারণ তখন প্রাদেশিক স্বা-তন্ত্র্য বোধ আবার জাগিয়া উঠিয়া পৃথক হইবার আন্দোলন আরম্ভ করিত, ফলে সাম্রাজ্যটির ভিতরের ঐক্য নষ্ট হইত, অথবা উত্তরদেশে উহার বিরাট বিস্তার ভাঙ্গিয়া পড়িত। কোনও নূতন বিপদ উপস্থিত হইলে, কোন এক নূতন বংশের অধীনে উহা আবার সবল হইয়া উঠিত, কিন্তু এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছিল যতদিন না বিপদটি বহুকালের জন্য অন্তর্হিত হওয়ায়, সেই বিপদ নিবারণের জন্য যে সাম্রাজ্যর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও চিরতরে লুপ্ত হইয়া গেল। তখন তাহার অবশিষ্ট রহিল পূর্ব্বে, দক্ষিণে ও মধ্যদেশে কতকগুলি মহান্ শক্তিশালী রাজ্য এবং উত্তর-পশ্চিমে রহিল অপেক্ষাকৃত বিশৃঙ্খল জনপুঞ্জ ; এই দুর্ব্বল ভাগই মুসল-

মানেরা আসিয়া ভেদ করে, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর দেশে সেই প্রাচীন সাম্রাজ্যটিকেই পুনর্গঠিত করে, তবে অন্য এক ধরণে, মধ্য এশিয়ার ধরণে।

এই সব পূর্ব্বতন বিদেশী আক্রমণ এবং ইহাদের ফলাফল সকলের প্রকৃত গুরুত্ব কি তাহা হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ প্রাচ্যবিষয়ক গবেষকগণের অতিরঞ্জিত থিওরি বা মতবাদের দ্বারা অনেক সময়েই ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণ ছিল বস্তুতঃ প্রাচীন গ্রীক্ সভ্যতার (Hellenism) পূর্ব্ব-মুখীন বিস্তার, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় তাহার কিছু কাজ করিবার ছিল, কিন্তু ভারতে তাহার কোনও ভবিষ্যৎ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হওয়ায় তাহার আর কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিল না। পরবর্ত্তী মৌর্য্যগণের দুর্ব্বলতার সময়ে গ্রীকো ব্যাক্‌ট্রিয়নগণের (Graeco Bactrians) যে-অভিযান ভারতে প্রবেশ করে, এবং সাম্রাজ্যটির পুনরুত্থিত শক্তির দ্বারা পরাভূত হয়, তাহা ছিল এমন এক গ্রীক সভ্যতাপ্রাপ্ত জাতির অভিযান যাহা ইতিপূর্ব্বেই ভারতীয় কৃষ্টির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। পরে পার্থিয়ান, হূন ও শকগণের যে আক্রমণ আইসে তাহা ছিল আরও গুরুতর, এবং কিছুকালের জন্য আশঙ্কা হইয়াছিল উহা বুঝি ভারতের বিশিষ্ট সভ্যতার পক্ষে

বিপজ্জনক হইবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারা কেবল পঞ্জাবকেই প্রবলরূপে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যদিও তাহারা তাহাদের তরঙ্গ পশ্চিম উপকূল দিয়া আরও দক্ষিণে প্রেরণ করিয়াছিল, এবং বহুদূর দক্ষিণে কিছুকালের জন্য বিদেশী রাজবংশও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এই সকল স্থানে জনগণের জাতিগত প্রকৃতি কতখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা আদৌ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। প্রাচ্য সম্বন্ধে গবেষণাকারী পণ্ডিতগণ এবং নৃবিজ্ঞানবিদ্‌গণ কল্পনা করিয়াছেন যে, পঞ্জাব শকজাতিতে পরিণত হয়, রাজপুতেরা শকেদেরই বংশধর, এমন কি আরও দক্ষিণে এই আক্রমণের দ্বারা জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল জল্পনাকল্পনা অতি অপর্য্যাপ্ত বা বিনা প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য থিওরি বা মতও আছে, এবং ইহা খুবই সন্দেহের বিষয় যে, আক্রমণকারীরা এত বেশী সংখ্যায় আসিয়াছিল যাহাতে এইরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে। আরও ইহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এই জন্য যে, দুই তিন পুরুষের মধ্যেই এই সকল আক্রমণকারীর দল সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সম্পূর্ণভাবেই ভারতের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, কৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভারতীয় জনসাধারণের

সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ সমূহে যেরূপ হইয়াছিল সেরূপ ভারতে বর্ব্বরজাতি সকল এক মহত্তর সভ্যতার উপরে নিজেদের আইন-কানুন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বর্ব্বর আচার ব্যবহার চাপাইয়া দিতে সক্ষম হয় নাই। এই সব আক্রমণের এই সাধারণ তথ্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, এবং ইহার তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আক্রমণ-কারীরা ছিল সম্ভবতঃ সৈন্যদল মাত্র, জনসমূহ নহে; বিদেশীশাসনরূপে তাহাদের অধিকার একাদিক্রমে বহুদিন স্থায়ী হইতে না পাওয়ায় তাহার বিজাতীয় রূপটি দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে নাই, কারণ প্রত্যেক আক্রমণের পরই ভারতীয় সাম্রাজ্যটি আবার সবল হইয়া উঠিত, এবং বিজিত প্রদেশ সকলকে পুনরধিকার করিয়া লইত; এবং শেষতঃ, ভারতীয় কৃষ্টি এমনই সতেজভাবে প্রাণময় ও গ্রহণশীল যে আক্রমণকারিগণের দিক হইতে কোনরূপ মানসিক বাধাই সাঙ্গীকরণের প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। যাহাই হউক, যদি এই সব অভিযান খুবই গুরুতর হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষাকৃত তরুণ গ্রীকো-রোমান্ সভ্যতা অপেক্ষা অধিকতর প্রাণশক্তি ও সুদৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিল; গ্রীকো-রোমান সভ্যতা টিউটন্ ও আরবদের আক্রমণে ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল, অথবা নীচে

পড়িয়া কোনরকমে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, বর্ব্বরতার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ও নিষ্পেষিত হইয়া তাহা এমনই হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তাহাকে আর চিনিবার উপায় ছিল না। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, রোমক সামাজ্য যতই সুদৃঢ়তা ও মহত্ত্বের গর্ব্ব করুক, ভারতীয় সাম্রাজ্যটি কার্য্যতঃ তাহা অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতার প্রমাণ দিয়াছিল, কারণ পশ্চিম প্রান্তে বিদ্ধ হইলেও ভারত উপদ্বীপের বিরাট ভাগকে সে নিরাপদ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পরে যে অধঃপতন হয়, আরবদের দ্বারা মুসলমান আক্রমণ কৃতকার্য্য না হইয়া বহুকাল পরে পুনরায় সেই চেষ্টা হয় এবং কৃতকার্য্য হয় এবং ইহার যে-সব পরিণাম হয়, তাহাই ভারতবাসীর সক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ দেয়। কিন্তু এখানে কতকগুলি প্রচলিত ভুল ধারণা নিরসন করা প্রয়োজন। এই পরাজয় ঘটিয়াছিল এমন এক সময়ে যখন প্রাচীন ভারতীয় জীবন ও কৃষ্টির প্রাণ-শক্তি দুই সহস্রবৎসর অপূর্ব্ব কর্ম্মপরায়ণতা ও সৃষ্টি-কুশলতার পরিচয় দিবার পর ইতিমধ্যেই সাময়িকভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অথবা অবসন্নতার খুব সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল, এবং সংস্কৃত ভাষা হইতে জনসাধারণের ভাষায় এবং নবোত্থিত প্রাদেশিক জাতিগুলির মধ্যে আনিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য কিছু নিঃশ্বাস-

ফেলিবার সময় প্রয়োজন হইয়াছিল। উত্তরাঞ্চলে মুসলমান-বিজয় খুবই দ্রুত সম্পাদিত হইয়াছিল, যদিও তাহা সম্পূর্ণ হইতে কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণ-দেশ ইতিপূর্ব্বে যেমন দেশীয় সাম্রাজ্যটির বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিল, এই মুসলমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও বহুকাল তেমনিই করিতে সক্ষম হইয়াছিল; আর বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংসের পর মহারাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হইতেও বেশী সময় লাগে নাই। রাজপুতেরা আকবর ও তাহার উত্তরাধিকারীদের সময় পর্য্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, এবং শেষকালে মোগলেরা, কতকটা তাহাদের রাজপুত মন্ত্রী ও সেনাপতিগণের সাহায্যের জোরেই, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে তাহাদের আধিপত্য পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আর ইহাও যে সম্ভব হইয়াছিল তাহার কারণ—এই কথাটা প্রায়ই ভুলিয়া যাওয়া হয়—মুসলমান শাসন অতি অল্পদিনই বিদেশী-শাসন ছিল। এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই জাতিতে ভারতীয় ছিল এবং এখনও রহিয়াছে, কেবল পাঠান, তুর্কি ও মোগল রক্তের যৎসামান্য সংমিশ্রণ হইয়াছে; আর বিদেশ হইতে আগত রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও অবিলম্বেই মনে, প্রাণে ও স্বার্থে ভারতীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবাসী যদি বাস্তবিক পক্ষে য়ুরোপের নানা দেশের ন্যায় বহু শতাব্দী ধরিয়া

বিদেশী শাসনের অধীনে নিশ্চেষ্ট, সম্মত, নিরুপায় হইয়া পড়িয়া থাকিত, সেইটাই হইত জাতির অন্তর্নিহিত এক মহাদৌর্ব্বল্যের নিঃসন্দেহ প্রমাণ; কিন্তু বস্তুতঃ ব্রিটিশ-শাসনই প্রথম বিদেশী শাসন একাদিক্রমে ভারতে আধিপত্য করিতেছে। প্রাচীন সভ্যতাটি মধ্য এশিয়া হইতে আগত ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সহিত সম্মিলিত হইতে না পারিয়া তাহার সঞ্চাপনে ম্লান ও ক্ষুন্ন হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে চাপ সে কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার উপরে নানাদিক দিয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং আমাদের সময় পর্য্যন্ত অবনত অবস্থাতে হইলেও জীবিত রহিয়াছে, পুনরভ্যুত্থানে সক্ষম রহিয়াছে। এই ভাবে সে যে শক্তি ও উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়াছে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাহা সুদুর্ল্লভ। আর রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উচ্চশক্তিশালী রাজা, রাজনীতিবিদ্, যোদ্ধা ও শাসনকর্ত্তার অভ্যুত্থান করিতে সে কখনও বিরত হয় নাই। অবনতির যুগে তাহার রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা এমন পর্য্যাপ্ত ছিল না, এমন সংহত এবং দৃষ্টিতে ও কর্ম্মে তৎপর ছিল না, যাহাতে পাঠান, মোগল ও য়ূরোপীয়গণের আক্রমণকে নিবারিত করা যাইত, কিন্তু সে-সকল আঘাত কাটাইয়া উঠিতে এবং পুনরভ্যুত্থানের প্রত্যেক সুযোগ গ্রহণ করিতে উহা সমর্থ ছিল, রাণা সুঙ্গের নায়কতায় সাম্রাজ্যগঠনের

প্রয়াস করিয়াছিল, মহান শক্তিশালী বিজয়নগর রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, রাজপুতানার পর্ব্বতমালায় বহুশতাব্দী ধরিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছিল, এবং অতি দুর্দ্দশার দিনেও দক্ষতম মোগল সম্রাটের সমগ্র শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া শিবাজীর রাজ্য গঠন করিয়াছিল, রক্ষা করিয়াছিল, মহারাষ্ট্র সমবায় (Mahratta confederacy) ও শিখ্ খাল্সা (Sikh Khalsa) গঠন করিয়াছিল, বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ক্ষয় করিয়া দিয়াছিল এবং পুনরায় সাম্রাজ্য গঠনের এক শেষ চেষ্টা করিয়াছিল। যখন চরম ও প্রায় মারাত্মক অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে, চারিদিকে বর্ণনাতীত অন্ধকার, অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা, তাহার মধ্যেও সে রণজিৎসিং ও নানা ফড়নবিশের অভ্যুত্থান করিয়া ইংলণ্ডের ভাগ্যলক্ষ্মীর অবশ্যম্ভাবী জয়যাত্রাকে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। মূল সমস্যাটি ঠিকমত দেখিবার ও সমাধান করিবার অক্ষমতা, নিয়তি পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নটি তুলিয়াছে তাহার সদুত্তর দিবার অক্ষমতা সম্বন্ধে যে অভিযোগ আনা যাইতে পারে, এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা সে অভিযোগের গুরুত্ব কিছুমাত্র কম হয় না বটে, কিন্তু যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, এই সব হইতেছে অবনতির যুগের ঘটনা, তাহা হইলে

তাহারা এমন এক বিস্ময়জনক ইতিহাস হয়, যাহার তুলনা সহজে অন্য কোথাও মিলিবে না, এবং লোকে যে অজ্ঞভাবে বলিয়া থাকে ভারত চিরকালই পরাধীন এবং রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে অক্ষম, তাহার পরিবর্ত্তে সমগ্র প্রশ্নটি এক সম্পূর্ণ নূতন আলোকে দেখা যায়।

মুসলমানবিজয়ের দ্বারা যে-সমস্যাটি উঠিয়াছিল, সেটি বস্তুতঃ বিদেশীর পরাধীনতা এবং তাহা হইতে মুক্ত হইবার সমস্যা ছিল না, সেটি ছিল দুই সভ্যতার দ্বন্দ, একটি প্রাচীন ও দেশীয়, অপরটি মধ্যযুগীয় এবং বাহির হইতে আনীত। সমস্যাটি অসমাধানীয় হইয়া উঠিয়াছিল এই জন্য যে, উভয়ের সহিতই জড়িত ছিল এক একটি শক্তিশালী ধর্ম্ম। একটি সংগ্রামপ্রিয় ও আক্রমণশীল, অপরটি আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া সহনশীল ও নমণীয় হইলেও, নিজের বৈশিষ্টের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠাসম্পন্ন এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অন্তরালে আত্মরক্ষাপরায়ণ। সমস্যাটির সমাধান দুই প্রকার হইতে পারিত, এমন এক মহত্তর অধ্যাত্মতত্ত্বের অভ্যুত্থান যাহা উভয়ের মধ্যে সমন্বয় বিধান করিতে পারিত, অথবা এমন রাষ্ট্রনীতিক দেশ-প্রেমের বিকাশ যাহা ধর্ম্মের দ্বন্দকে অতিক্রম করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মথ্যে ঐক্যসাধন করিতে পারিত। প্রথমটি সে যুগে অসম্ভব ছিল। মুসলমানদের দিক

হইতে আকবর সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম ছিল বস্তুতঃ মানসিক বুদ্ধির সৃষ্টি, রাষ্ট্রনীতি-প্রসূত, তাহা আধ্যাত্মিক সৃষ্টি ছিল না, এবং সম্প্রদায় দুইটির প্রবল ধর্ম্মশীল মন যে সে ধর্ম্ম কখনও গ্রহণ করিবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। হিন্দুদের দিক হইতে নানক ঐ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম মূলনীতিতে সার্ব্বজনীন হইলেও, কার্য্যতঃ তাহা সাম্প্রদায়িক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আকবর এক সাধারণ রাষ্ট্রনীতিক দেশপ্রেম সৃষ্টি করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টারও ব্যর্থতা প্রথম হইতেই অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেই বাঞ্ছনীয় মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইলে, উভয় সম্প্রদায়ের শক্তিমান পুরুষ, রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের ভিতর দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের কার্য্যকরী শক্তিকে আকৃষ্ট করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ ভারত সাম্রাজ্য গঠনের কার্য্যে লাগাইতে হইত; কিন্তু মধ্য এশিয়ার আদর্শে গঠিত স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব ছিল না; দেশবাসীর জাগ্রত সম্মতি প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার মত রাষ্ট্রনীতিক আদর্শ ও অনুষ্ঠান সকলের অভাবে তাহা সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। মোগল সাম্রাজ্যটি ছিল এক মহান্ ও চমৎকার সৃষ্টি, তাহার গঠন ও সংরক্ষণে অপরিসীম রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা ও

বুদ্ধি নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহা ছিল কীর্ত্তিমণ্ডিত, শক্তিশালী, জনহিতসাধক, এবং আরও বলা যাইতে পারে যে, আউরঙ্গজেবের প্রবল গোঁড়ামি সত্ত্বেও সেটি ধর্ম্মের ব্যাপারে মধ্যযুগের ও সমসাময়িক সকল য়ুরোপীয় রাজ্য ও সাম্রাজ্যের তুলনায় যে কত বেশী উদার ও সহনশীল ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এবং তাহার অধীনে ভারত সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিক শক্তিতে, আর্থিক ঐশ্বর্য্যে এবং আর্ট ও কৃষ্টির গৌরবে অনেক উচ্চে উঠিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের ন্যায় এইটিও, বরং আরও শোচনীয় ভাবেই, ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, এবং সেই একই প্রণালীতে, বহিঃশত্রুর আক্রমণে নহে, অন্তর্বিপ্লবের ফলে। সামরিক ও শাসনমূলক কেন্দ্রগত সাম্রাজ্যের দ্বারা ভারতের জীবন্ত রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যসাধন সম্ভব হয় নাই। আর যদিও প্রদেশ গুলিতে নবজীবনের অভ্যুত্থান দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে য়ুরোপীয় জাতিগণের অনাহূত আগমনে এবং দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণে, সে সম্ভাবনা মুকুলেই বিনষ্ট হইয়াছিল; পেশোয়াগণের অকৃতকার্য্যতা এবং তাহার পরবর্ত্তী অরাজকতা ও অধঃপতনের বিষম বিশৃঙ্খলা তাহাদিগকে এই সুযোগ প্রদান করিয়াছিল।

ভাঙ্গনের যুগে দুইটি বিশিষ্ট সৃষ্টির দ্বারা ভারতের

রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা পুরাতন অবস্থা-পরম্পরার মধ্যে নবজীবনের ভিত্তি স্থাপন করিবার শেষ প্রয়াস করিয়াছিল, কিন্তু কোনটিই কার্য্যতঃ সমস্যাটির সমাধান করিবার মত উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। রামদাসের মহারাষ্ট্র-ধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং শিবাজী কর্ত্তৃক সংগঠিত মারাঠা অভ্যুত্থান ছিল প্রাচীন আদর্শ ও অনুষ্ঠানের যাহা কিছু জানা বা বুঝা যায় তাহাই পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা ; কিন্তু প্রারম্ভে অধ্যাত্ম প্রেরণা ও প্রজাতান্ত্রিক শক্তি সকলের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও তাহা কৃতকার্য্য হয় নাই, বস্তুতঃ অতীতকে এইরূপে ফিরাইয়া আনিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। পেশোয়াগণ তাঁহাদের সকল প্রতিভা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিটি লাভ করিতে পারেন নাই। তাহারা কেবল এক সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিক সমবায়েরই (Confederacy) সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। আর তাহাদের সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা কৃত্যকার্য্য হয় নাই কারণ তাহার মূলে ছিল প্রাদেশিকতা, তাহা নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জীবন্ত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে নাই। অপর পক্ষে শিখ্ খাল্‌সা ছিল এক আশ্চর্য্য রকমের মৌলিক ও নূতন সৃষ্টি, তাহার দৃষ্টি অতীতের দিকে নহে, ভবিষ্যতের দিকেই প্রসারিত ছিল।

গভীর আধ্যাত্মিক সূচনা, ধর্ম্মগুরুর নেতৃত্ব, সাম্যতান্ত্রিক সংগঠন, ইস্‌লাম ও বেদান্তের গভীরতম সত্যগুলির সমন্বয় সাধন করিবার প্রথম চেষ্টা, এই সব লইয়া এই অপরূপ ও অভিনব অনুষ্ঠান ছিল মানব সমাজের তৃতীয় বা অধ্যাত্ম স্তরে প্রবেশ করিবার অকাল প্রয়াস; কিন্তু উহা আধ্যাত্মিকতা ও বাহ্য জীবনের মধ্যে যোগ-সাধক সমৃদ্ধ সৃষ্টিমূলক চিন্তা ও কৃষ্টির বিকাশ করিতে পারে নাই। এই ভাবে ক্ষুন্ন ও অসম্পূর্ণ হওয়ায়, সে চেষ্টা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক গণ্ডীর মধ্যেই আরম্ভ ও শেষ হইয়াছিল, প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু প্রসারতার শক্তি লাভ করিতে পারে নাই। যে অবস্থা-পরম্পরার মধ্যে ঐরূপ চেষ্টা কৃতকার্য্য হইতে পারিত তখন সে সবের অস্তিত্ব ছিল না।

তাহার পর আসিল নিশার অন্ধকার, সকল রাষ্ট্রনীতিক উদ্যম ও সৃষ্টি সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল। আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বে পাশ্চাত্য আদর্শ ও অনুষ্ঠানগুলি দাস-সুলভ নিষ্ঠার সহিত অনুকরণ ও গ্রহণ করিবার যে প্রাণহীন প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, তাহা হইতে ভারত-বাসীর রাষ্ট্রনীতিক মনীষা ও প্রতিভার কোনও সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার অনেক ভ্রান্তি-কুজ্‌ঝটিকার মধ্যেও এক নূতন সন্ধ্যার আলোক দেখা যাইতেছে, প্রদোষের সন্ধ্যা নহে, প্রভাতেরই যুগ

সন্ধ্যা। যুগযুগান্তের **ভারত মরে নাই,** তাহার সৃষ্টির শেষ কথাও এখনও বলা হয় নাই ; সে জীবিত রহিয়াছে, নিজের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য এখনও তাহার কিছু করিবার রহিয়াছে। আর এখন যাহা জাগ্রত হইতে চাহিতেছে, তাহা একটা ইংরাজীভাবাপন্ন (Anglicised) প্রাচ্য জাতি নহে, পাশ্চাত্যের অনুগত শিষ্য হওয়া এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলাফল গুলির পুনরভিনয় করাই তাহার নিয়তি নহে, পরন্তু তাহা এখনও সেই প্রাচীন স্মরণাতীত কালেরই **শক্তি** পুনরায় নিজের গভীরতর আত্মার সন্ধান পাইতেছে, সকল জ্যোতি ও শক্তির পরম উৎসের দিকে নিজের মাথা আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিতেছে, নিজের **ধর্ম্মের** পূর্ণ অর্থ ও বিশালতর রূপ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

সম্পূর্ণ

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত। মূল্য ১ম খণ্ড—১।০, ২য়—২॥০, ৩য়—১।০।

শ্রীঅরবিন্দ—"অনুবাদ খুবই ভাল হইতেছে। সাধারণ পাঠকেরা এই অনুবাদের সাহায্যে সহজেই গীতার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।"

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—"এ অনুবাদ-কার্য্যে গ্রন্থকার বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। জিজ্ঞাসু পাঠক এই গ্রন্থপাঠে গীতার অনেক মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং গীতারহস্যের অনেক প্রচ্ছন্ন গুহা নবালোকে উদ্ভাসিত দেখিবেন।"

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—"আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিতই বলিতে পারি যে, এই বাংলা বইখানি পাঠ করিয়া আমি বিশেষ লাভবান হইয়াছি।"

S. D. Karandikar—"Your book is a great friend to me and it has brought a real and good change in my way of life."

P. Seshadri—"The wonderful manner in which you have conveyed the sense and spirit of, the original is beyond all praise."

বসুমতী—"বর্ত্তমান যুগে এইরূপ গ্রন্থের নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

চিত্রে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত—

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ ছাড়া ভূমিকায় বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

তীর্থভ্রমণে—কাশী

শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

এই তীর্থস্থানের প্রধ'ন প্রধান দৃশ্যগুলির এগারখানি ফুল সাইজ ছবি দেওয়া হইয়াছে। তীর্থ যাত্রীর পথ নিদর্শকরূপে এই পুস্তকখানি হিন্দুগৃহে বিরাজ করিবে।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল সাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের

নূতন বই

আধুনিকী

ভাল ছাপা—ভাল বাঁধাই

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভারতের-নারী

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—প্রণীত

পঞ্চম সংস্করণ

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

THE ILLUSION OF THE CHARKA.

By Anil Baran Ray. Price Re. 1/4 only.

Discussing in full the injury done to the country by the *Khaddar* movement of Mahatma Gandhi, the author gives a comprehensive analysis of the deep and chronic poverty of the Indian masses as well as its truly effective remedy.

"Nine chapters in all make up the volume and they are all interesting reading. Sj. Ray's arguments which are supported by facts and figures cannot be summarily dismissed"—*The Amrita Bazar Patrika.*

"The book is worth being read by those who want to study the question from other than the sentimental point of view"—*The Mahratta (C. P.).*

"In this little book the author examines all the claims of the charka. The book is of special interest, because it is written by one who has worked heart and soul for *khadi* and who is now disillusioned. His criticism of the charka is therefore neither perverse, nor based on prejudice and ignorance."—*The Indian Review.*

"The author presents his case in a well-reasoned manner and his arguments deserve careful attention".—*The Modern Review.*

"A careful perusal of the bo k can lead to only one conclusion, viz, that Mr. Ray has demonstrated to the satisfaction of all candit and impartial persons that the *charka* programme is in the main a futile one"—*The Federated India (Madras).*

"Mr. Ray makes it plain that he continues to have the very highest respect for Mr. Gandhi though he relentlessly exposes that great leader's mistake in spousing a movement which is calculated to perpetuate rather than to relieve the poverty of the Indian masses"—*The Pioneer (Allahabad).*

"Mr. Ray's arguments are well-nigh irrefutable. The sooner our people break the illusion of the charka the better"—*The Prabuddha Bharata.*

MEMORIES OF MY LIFE AND TIMES

(In three Volumes)

By

BIPIN CHANDRA PAL

Vol. I (from 1857—1884) Rs. 5. (Just out)
Vol. II. („ 1885—1904) Rs. 5. (In the Press.)
Vol. III. („ 1905—1931) Rs. 5. (In preparation.)

REFLECTION

Containing the following articles (1) Power and Purpose. (2) The world and the land of the departed. (3) The world state and National Self-Rule. (4) Lunacy in the Air.

BY

ULLASKAR DUTTA

An Author of "Twelve Years of Prison Life."

Price annas 8

PANDIT MOTILAL NEHRU

HIS LIFE AND WORK

WITH A FOREWORD BY

Prof. DEVAPRASAD GHOSH, M.A., B.L.

EDITED BY

UPENDRA CHANDRA BHATTACHARYYA

AND

SHOVENDU SUNDAR CHAKRAVARTTY

(SECOND EDITION)

Imitation Morocco Leather Bound.

Price Re. 1-8